কোটিপতি সাহাবি

ব্যবসায়ী সাহাবিদের জীবনী

আরিফুল ইসলাম



'সাহাবিরা গরিব' ছিলেন এমন ধারণা অনেকের মধ্যে আছে। সাহাবিরা কি আসলেই গরিব ছিলেন নাকি তারা স্বেচ্ছায় এমন জীবনযাপন করতেন যা দেখে মনে হয় তারা 'গরিব'?

খাইবার বিজয় পরবর্তী মুসলিম দুনিয়ায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটে। বেশিরভাগ সাহাবির অর্থনৈতিক জীবন পাল্টে যায়। পাল্টে যাওয়া অর্থনৈতিক জীবন তারা কীভাবে যাপন করেন এই নিয়ে বইটিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অনেক সাহাবি ছিলেন কোটিপতি। মৃত্যুর আগে তারা কয়েকশো কোটি টাকার সম্পদ রেখে যান। যাদেরকে আমরা 'গরিব' বলে জানি, তারা পর্যন্ত একদিনে কোটি টাকার সম্পদ দান করতেন। সাহাবিদের অর্থনৈতিক জীবনের অজানা অধ্যায় নিয়ে এই বই।

মূল্য : টাকা ৩১০
Price : Taka 310 | US$ 7

কোটিপতি সাহাবি

ব্যবসায়ী সাহাবিদের জীবনী

আরিফুল ইসলাম

ইলহাম

কোটিপতি সাহাবি

আরিফুল ইসলাম

প্রকাশক
ইলহাম
৩/১-এইচ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

তৃতীয় মুদ্রণ
জুলাই ২০২৩

প্রকাশকাল
জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
জুন ২০২৩

প্রচ্ছদ
আবুল ফাতাহ মুন্না

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

একমাত্র পরিবেশক
ঐতিহ্য

KOTIPOTI SAHABI by Ariful Islam
Published by Ilham
Date of Publication : June 2023
E-mail : ilhampublications@gmail.com

Copyright © 2023 Writer
All rights reserved. Any form of reproduction whether in printed or digital or by any other means. Without written permission from the publisher is protected by law and Divine regulation. The violator will be subjected to local law and will be sued.

"তাকওয়ার অধিকারী লোকদের
ধন-সম্পদের মালিক হওয়াতে কোনো দোষ নেই।"

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

সূচি

লেখকের কথা ১১
ভূমিকা ১৭
ব্যবসার প্রতি রাসূল (সা.) এবং সাহাবিদের উৎসাহবাণী ২৯
তৎকালীন আরবের ১২টি বাজার ৩৪
সাহাবিদের যুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ৪০
উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু ৪২
আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু ৫০
তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ৭৩
যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু ৮৬
আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ৯৩
সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু ১১১
আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ১১৫
উম্মুল মুমিনিনদের সম্পদ এবং দানের পরিমাণ ১২২
পরিশিষ্ট ১২৭
হাতে দুনিয়া, হৃদয়ে আল্লাহ ১২৯
ব্যবসাও একটি নেক আমল ১৩৬

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর।

ইসলামের প্রয়োজনে আর্থিক সহযোগিতার দরকার পড়লে বিত্তবান সাহাবিরা এগিয়ে আসতেন। আবু বকর, উসমান, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুম অকাতরে দান করতেন। সাহাবিদের দানের গল্পগুলো বেশ প্রসিদ্ধ। 'সাহাবিরা অনেক দান করতেন, আপনারাও দান করুন'— এই বাক্য বলার সময় আমরা অনেকেই পাল্টা জিজ্ঞেস করতে পারি না, সাহাবিরা দান করার জন্য সম্পদ উপার্জন করতেন কীভাবে? যে ব্যক্তি ২০ হাজার টাকা দান করলো, সেই ব্যক্তি তো অন্তত ২০ হাজার টাকা উপার্জন করেছে। সাহাবিদের দানের গল্পের আগের গল্প হলো তাদের উপার্জনের গল্প।

উপার্জন সম্পর্কে তারা অবাস্তব ধারণা লালন করতেন না। তারা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতেন না। উপার্জন করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে এই বিষয়টি তাদের কাছে পরিষ্কার ছিল। 'উট বেঁধে তাওয়াক্কুল' ছিল সাহাবিদের নীতি। তারা আল্লাহর ইবাদত করতেন বলে আকাশের পানে তাকিয়ে থাকতেন না এই আশায়, কিছু না করেই আল্লাহ তাদেরকে ধন-সম্পদ দিবেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

> *"তোমাদের মধ্যে কেউ যেন উপার্জন ছেড়ে বসে না থাকে এবং বলে 'হে আল্লাহ! আমাকে রুজি দাও'। অথচ তার জানা থাকা চাই, আকাশ থেকে সোনা-রুপার বৃষ্টি ঝরে না; বরং আল্লাহ মানুষের এক হাতের মাধ্যমে অন্য হাতকে রুজি দিয়ে থাকেন।"*

সাহাবিদের অর্থনৈতিক জীবনকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। খাইবার বিজয়ের পূর্বের অবস্থা এবং খাইবার বিজয় পরবর্তী অবস্থা।

সাহাবিরা খেতে পারতেন না, গাছের লতাপাতা খেয়ে জীবনধারণ করতেন, ছেঁড়া জামা পরতেন, তালিযুক্ত জামা পরতেন, কেউ খাওয়াবে এই আশায় তার বাড়ি পর্যন্ত যেতেন— এই ধরনের যতো গল্প আছে, বেশিরভাগই খাইবার বিজয়ের পূর্বের।

খন্দকের যুদ্ধে মদিনা ছিল অবরুদ্ধ। চারদিক থেকে শত্রুবাহিনী ঘেরাও করা। সবাই যুদ্ধে ব্যস্ত। বাইরে থেকে পণ্য আসছে না। এমন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবিগণ ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে পরিখা খনন করেন। তাই বলে তারা সারাজীবন পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন না।

এমনও সময় ছিল সাহাবিরা উপোস থাকতেন, খাবার ছিল না। আবার এমনও সময় আসে, যখন সাহাবিদের সামনে বিভিন্ন ধরনের খাবার আসে। সেগুলো দেখে তারা অতীত ঘটনার স্মৃতি রোমন্থন করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

> *"খাইবার বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত আমরা তৃপ্ত হয়ে খেতে পারিনি।"*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে দুই মাস চুলা জ্বলত না সংক্রান্ত ঘটনাগুলোর টাইম ফ্রেইম দেখলে দেখা যাবে সেগুলো ছিল বিশেষ মুহূর্তে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবিগণ ছিলেন অল্পে তুষ্ট। তারা এমন জীবনযাপন স্বেচ্ছায়, সানন্দে বেছে নেন, যে জীবনযাপন দেখে আমাদের মনে হয় তারা বুঝি গরিব। গরিব ছিলেন বলেই বুঝি খেতে পারতেন না।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

> *"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন রহমতের বায়ু অপেক্ষাও অধিক দানশীল।"*

যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমত, উপহার লাভের পরিমাণ দেখলে এটা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, রাসূলুল্লাহ গরিব ছিলেন; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবিদেরকে গরিব বললে তাদের দানশীলতার গল্প, তাদের আর্থিক ত্যাগের গল্প ঢাকা পড়ে যায়।

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে দুই মাস রান্না হয়নি' এই কথার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর চমৎকার ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। তিনি মদিনার সবচেয়ে ক্ষমতাশীল ব্যক্তি, মদিনায় উসমান, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, আবু আইয়ুব আনসারী, সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো ধনী সাহাবি ছিলেন। সামান্য ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে সেসব ধনী সাহাবি খাদ্যের পাহাড় নিয়ে হাজির হতেন। অথচ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনোটাই করেননি। তাঁর বাসায় যে দুই মাস রান্না হয়নি, সেটা তিনি কাউকে বুঝতে দেননি। তাঁর ইন্তেকালের পর সাহাবিরা সেটা জানতে পারেন।

অথচ ঐ ঘটনা দিয়ে বোঝানো হয় তাঁর অর্থনৈতিক দুর্দশার কথা। অন্যদিকে তাঁর ব্যক্তিত্বের কথা ঢাকা পড়ে যায়।

সাহাবিদের বেলায়ও একই ঘটনা ঘটে। সাহাবিদের গরিব দেখানোর মাধ্যমে তাদের অন্যান্য গুণ ঢেকে যায়।

'কোটিপতি সাহাবি' বইটি লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সাহাবিদের ব্যক্তিত্ব, সম্পদের সাথে তাদের ব্যবহার, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে দান করার ঘটনাগুলো তুলে ধরা। আল্লাহর কাছে একজন দুর্বল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মুমিন বেশি প্রিয়। সাহাবিরা সম্পদ উপার্জন করে সম্পদের মনিব হন, কিন্তু সম্পদ তাদের মনিব হয়নি। বর্তমান যুগের পুঁজিবাদী, ভোগবাদী মানসিকতা এবং সাহাবিদের যুহুদের পার্থক্য এই জায়গায়। বর্তমানে যারা কোটিপতি হচ্ছে, তাদের অনেকেই অর্থের গোলাম হচ্ছে। অথচ সাহাবিরা কোটিপতি হওয়া সত্ত্বেও অর্থ তাদের ঈমান-আমলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি।

বাংলা ভাষায় এই ধারার কাজ খুব সম্ভবত এটাই প্রথম। যার কারণে বেশ সতর্কতার সাথে কাজটি করতে হয়েছে। তার ওপর সাহাবিদের সম্পদের পরিমাণ সহজে পাওয়া যায় না। এটা ধারণা করে নিতে হয় তাদের দানের পরিমাণ থেকে। সাহাবিরা সাধারণত তাদের সম্পদ নিয়ে গর্ব করে বলতেন না যে, আমি এতো কোটি দিরহামের মালিক। তারা বরং তাদের দানের কথা বলতেন।

আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

> *"একসময় আমি ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বাঁধতাম। অথচ আজ আমার সাদকার পরিমাণ ৪০০০ দিনার!"*

বইয়ে অর্থের পরিমাণ টাকায় বোঝানোর জন্য Purchasing Power of Money (PPM) ফর্মুলা ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, সেই যুগে ১ দিনার দিয়ে একটি ভেড়া কেনা যেত। তার মানে ১ দিনার সমান বর্তমানে একটি ভেড়ার মূল্য। বর্তমানে একটি ভেড়ার দাম ১০,০০০ টাকা হলে ১ দিনার = ১০,০০০ টাকা।

আরেকভাবে হিসাব করা যেত। সেটা হলো Gold Standard। ১ দিনার সমান ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ। ১ গ্রাম স্বর্ণের দাম ৫,০০০ টাকা ধরলে ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণের দাম ২১২৫০ টাকা।

আমরা পুরো বইতে PPM অনুযায়ী হিসাব করেছি। গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হিসাব করলে অর্থের পরিমাণ বেশি হবে।

বইয়ে উল্লিখিত সাহাবিদের বাইরেও অনেক ব্যবসায়ী সাহাবি আছেন। সবচেয়ে ধনী সাহাবি হিসেবে পরিচিত উসমান, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী আছে। তালহা-যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা যে এতো সম্পদের মালিক ছিলেন, সেটা অনেকেই জানেন না; এমনকি সেই যুগেও অনেকেই জানতেন না। বিশেষ করে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্পদের কথা। আবু হুরাইরা-খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এই বইয়ে 'গরিব' সাহাবিদের প্রতিনিধি, যারা পরবর্তীতে কোটিপতি হন। সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু আপ্যায়নকারী সাহাবিদের প্রতিনিধি, যিনি নিজের সম্পদ দিয়ে মানুষকে খাওয়াতে পছন্দ করতেন। তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করেন, আল্লাহ যেন তাঁর সম্পদ বাড়িয়ে দেন। এই জায়গায় তিনি ব্যতিক্রম। অন্যদিকে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কিশোর সাহাবিদের প্রতিনিধি, যারা পরবর্তীতে ধনী হন।

এই বিষয়ে পড়াশোনার আগ্রহ জন্মে শায়খ তাওফিক চৌধুরীর একটি আলোচনা শুনে। 'The World in the Hands, Allah in the Heart' বইটির সাথে প্রাসঙ্গিক লেকচারটির অনুবাদ পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।

২০১০ সালে মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ আম্বুর শহরে আয়োজিত এক সম্মেলনে উপস্থিত শত শত ব্যবসায়ীদের সামনে ব্যবসার

গুরুত্ব নিয়ে একটি ভাষণ প্রদান করেছিলেন। মাসিক আল-কাউসার পত্রিকায় প্রকাশিত ভাষণটির অনুবাদ বইয়ের পরিশিষ্ট অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

বইটির শার'ঈ দিকগুলো দেখেছেন মাওলানা মুজাক্কাজ নাঈম। বইটি লেখাকালে লম্বা সময় তাঁর সাথে আলোচনা করতাম। তাঁর পর্যালোচনামূলক ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ইলহাম বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছে। প্রকাশনীর সাথে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আশা করি বইটি পাঠকের চিন্তাজগতে নাড়া দিবে। সাহাবিদের জীবন নিয়ে নতুন করে ভাবতে অনুপ্রেরণা যোগাবে। বই সংক্রান্ত পর্যালোচনা, মন্তব্য আমাদেরকে জানালে আমরা সেগুলো বিবেচনা করে সংযোজন, সংশোধন করব।

আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

আমিন।

আরিফুল ইসলাম
পুরানা পল্টন, ঢাকা
৫ জুন ২০২৩
ariful459203@gmail.com

ভূমিকা

অর্থ-সম্পদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ স্বভাবজাত, যা সে সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়মেই পেয়েছে। সম্পদের প্রতি এই আজন্ম মোহ কোনো অর্থেই নেতিবাচক কিছু নয়, বরং এর সাথে মানবজাতির অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত। 'বস্তুত আল্লাহ তায়ালাই অভাবশূন্য, বাকি সকলেই পরমুখাপেক্ষী।' সম্পদের আকাঙ্ক্ষা এই মুখাপেক্ষিতা থেকেই সৃষ্ট, বরং এর প্রতিষেধক হিসেবে পাওয়া এক বিশেষ নিয়ামত। সম্পদের আকাঙ্ক্ষা না থাকলে পরমুখাপেক্ষী মানুষের জীবনযাত্রা স্থবির হয়ে যেত। এজন্য আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পদে পদে সম্পদের মুখাপেক্ষী করেছেন, আর সম্পদকে করেছেন আকর্ষণীয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> *'নারী, সন্তান—সন্ততি, স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপ, বাছাই করা ঘোড়া, গবাদিপশু এবং খেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসবই পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু।'*[১]

আল্লাহ তায়ালা মানুষের স্বভাবকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই দিয়েছেন শরীয়াহ। এজন্য দুইয়ের মধ্যে এতটুকু তফাত নেই। সম্পদে আকৃষ্ট এ স্বভাবের প্রতিই আল্লাহ তায়ালার আহ্বান—

> *তিনিই তো তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সবকিছু।*[২]

লক্ষ করুন, সম্পদের আকর্ষণই যাদের স্বভাব, তাদেরকে বলা হচ্ছে, দুনিয়ার সবকিছু তোমারই জন্য। এতে কি সম্পদ অর্জনের প্রতিই মানুষের দৃষ্টি আরও বেশি নিবদ্ধ হবে না?

---

১ সূরা আলে ইমরান : ১৭

২ সূরা বাকারা : ২৯

'পৃথিবীর সবকিছুই তোমাদের জন্য' কথাটা খুবই শক্তিশালী, মূলনীতিস্বরূপ। এ ধরনের আয়াতকে ফকিহগণ মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে বলেছেন, 'পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুই মূলগতভাবে হালাল, শুধু সেগুলো ব্যতিক্রম, যাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।' এটি ফকিহগণের নিকটে একটি প্রসিদ্ধ কায়েদা। এই কায়েদাকে সামনে রেখে তারা অসংখ্য মাসয়ালার সমাধান বের করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হাদিসেও এ মূলনীতি পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ঘি, পনির এবং বন্য গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

> *'যেসব জিনিস আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে হারাম করেছেন তা হারাম। আর যেসব জিনিস সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন তা তিনি ক্ষমা করেছেন।'*[৩]

কুরআনুল কারিমে এ ধরনের আরও অসংখ্য আয়াত রয়েছে যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, বিশ্বজগৎ এবং এর যাবতীয় নিয়ম-রীতিকে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। বরং কোনো কোনো আয়াতে এগুলো ব্যবহার করা এবং ভোগ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এমনকি রাত-দিনের পালাবদল এবং প্রকৃতির অন্যান্য নিয়মাবলি কিভাবে মানুষের ব্যবসা-বানিজ্য ও উপার্জনের উপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলোও তুলে ধরা হয়েছে।[৪] সম্পদকেন্দ্রিক যাবতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে এই আয়াতগুলোর নির্দেশনাই মূল, কেননা এতে বিশ্বজগৎ এবং এর সম্পদ-ভাণ্ডারের সৃষ্টিগত হাকিকত বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলোর সাথে মানুষের সৃষ্টিগত সম্পর্ক কেমন, তা এসকল আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে। তাই সম্পদকেন্দ্রিক যাবতীয় আলোচনায় এ আয়াতগুলোকে মূল হিসেবে গ্রহণ করে বাকি দলিলগুলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে।

এ আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায় সৃষ্টিগত দিক থেকে বিশ্বজগৎ এবং এর সম্পদ-ভাণ্ডারের মধ্যে কোনো অকল্যাণ নেই। এগুলো সবই মানুষের জীবনযাত্রার হাতিয়ার বা উপকরণ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সত্তাগতভাবে এগুলো শুধু কল্যাণকরই না, বরং কল্যাণের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট। সম্পদ থেকে

---

৩ সুনানে দারাকুতনী : ২/১৩৭, মুস্তাদরাকে হাকিম : ২/৪০৬, জামে তিরমিজি : ১৭২৬, ইবনে মাজাহ: ৩৬৬৭।

৪ সূরা জাসিয়া : ১৩, সূরা আ'রাফ : ৩২, সূরা নাবা : ১১; সূরা আ'রাফ : ১০; সূরা বাকারা : ১৯৮

প্রকাশিত যে অকল্যাণ, তা আহরণগত ও ব্যবহারগত। যেমন : তরবারি সৃষ্টিগতভাবে একটি উপকরণ, হাতিয়ার। সৃষ্টিগতভাবে এটি কল্যাণজনক। এটি যেমন জিহাদের উপকরণ হতে পারে তেমনি অন্যায় হত্যাকাণ্ডেরও মাধ্যম হতে পারে। এ হত্যাকাণ্ডের জন্য তরবারিকে দায়ী করা যায় না, তরবারি নির্মাতাকেও কাঠগড়ায় তোলা যায় না। কিংবা তরবারি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণাও করা যায় না। কারণ তরবারির সৃষ্টিগত উদ্দেশ্য অকল্যাণ নয়, বরং কল্যাণ। সম্পদের ব্যাপারটিও এমন; সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের প্রয়োজনে। সম্পদকেন্দ্রিক যাবতীয় অনিষ্ট এর ব্যবহারিক ত্রুটির কারণে। এজন্য সম্পদকে সত্তাগতভাবে দোষারোপ করা যায় না।

ইসলামে ন্যূনতম সম্পদ আহরণকে আবশ্যক করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'হালাল রুজি অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপরে ওয়াজিব'।[৫] বলা হয়েছে, 'হালাল রুজির অন্বেষণ ফরজের পরে আরেকটি ফরজ'।[৬] কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, 'হালাল রুজি অন্বেষণ করা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত'।[৭] একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, 'আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কর্মঠ বান্দাদের পছন্দ করেন।'[৮] ইমাম বুখারি (রহ.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস বর্ণনা করেছেন : 'নিজ হাতে উপার্জনকৃত খাদ্যের চেয়ে উত্তম কিছু কেউ কখনো ভক্ষণ করেনি। আল্লাহর নবি দাউদ (আ.) সর্বদা নিজ হাতে উপার্জনকৃত বস্তু আহার করতেন।'[৯] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, যাকারিয়া (আ.) কাঠমিস্ত্রি ছিলেন।[১০]

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'আদম (আ.) ছিলেন কৃষক, নূহ (আ.) ছিলেন ছুতার বা কাঠমিস্ত্রি, ইদরীস (আ.) ছিলেন দর্জি, ইবরাহিম ও লুত (আ.) ছিলেন চাষি, সালেহ (আ.) ছিলেন ব্যবসায়ী, দাউদ (আ.) লৌহবর্ম

---

৫ তাবরানী, মুজামুল আওসাত : ৮৬১০। হাইসামী রহ. এর সনদকে হাসান বলেছেন (মাজমাউজ যাওয়ায়েদ : ১০/২৯১)।

৬ তাবারানী, মু'জামুল কাবীর : ৯৯৯৩; বায়হাকী, সুনানে কুবরা : ১১৬৯৫; কানযুল উম্মাল : ৯২০৩, ৯২০৪, ৯২০৫।

৭ আল-কুযায়ী, মুসনাদুশ শিহাব : ৮২; কানযুল উম্মাল: ৯২০৩, ৯২০৪, ৯২০৫।

৮ কানযুল উম্মাল : ৯১৯৯, ৯২৩৯; তাবারানী : ১৩২০০; বায়হাকী, শুআবুল ঈমান : ১২৩৮।

৯ সহিহ বুখারি : ২০৭২।

১০ সহিহ মুসলিম : ২৩৭৯।

নির্মাতা এবং মুসা, শুআইব ও আমাদের নবি সা. ছিলেন রাখাল।'[১১] এ থেকে বোঝা যায়, নবিগণও প্রয়োজনীয় সম্পদ উপার্জনের পেছনে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছেন। অবশ্য তারা এক্ষেত্রে প্রয়োজনের সীমাকে অতিক্রম করেননি। কারণ তারা প্রেরিত হয়েছিলেন মানবতার মুক্তির দূত হিসেবে। তাই তাঁদের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে দাওয়াহ ও ইসলাহসংক্রান্ত বিষয়গুলো সর্বদা প্রাধান্য পেয়েছে।

দুই

একটি আয়াতে 'সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদকে ফিতনার উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোনো কোনো হাদিসেও সম্পদকে 'পরীক্ষা' বলা হয়েছে : 'নিশ্চয় প্রত্যেক জাতির জন্য পরীক্ষা রয়েছে, আমার উম্মাহর পরীক্ষা হলো সম্পদ।'[১২] এসকল নির্দেশনা থেকে অনেকে সম্পদকে নেতিবাচক হিসেবে উপস্থাপন করে। একটু গভীর চিন্তা করলে বোঝা যায়, এ দৃষ্টিভঙ্গি মোটেও সঠিক নয়। এসকল আয়াত ও হাদিসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, সম্পদের পাশাপাশি সন্তান-সন্ততিকেও ফিতনা বলা হয়েছে। কোনো কোনো হাদিসে নারীকেও ফিতনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে : 'আমার পরে নারীদের চেয়ে বড় কোনো ফিতনা আমি রেখে গেলাম না'।[১৩] তাহলে সম্পদ, নারী, সন্তান সবগুলোই কি নেতিবাচক?

ইমাম নাসাঈ (রহ.) তাঁর সংকলিত সুনানে 'বাবু হুব্বিন-নিসা' (নারীদের প্রতি ভালোবাসা) নামে একটি অধ্যায় সংকলন করেছেন। সেখানে মারফু সনদে বর্ণনা করেছেন, 'দুনিয়ায় নারী এবং সুগন্ধিকে আমার নিকটে প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। আর নামাজে রয়েছে আমার চোখের শীতলতা।'[১৪] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খাদিম আনাস (রা.) বলেন :

> *'নারীর পরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকটে ঘোড়া অপেক্ষা আর কিছুই এতটা প্রিয় ছিল না।'*[১৫]

---

১১ ইবনে কুদামাহ, মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদীন : ৮২।

১২ জামে তিরমিজি : ২৩৩৬।

১৩ সহিহ বুখারি : ৫০৯৬, সহিহ মুসলিম : ২৭৪০।

১৪ সুনানে নাসাঈ : ৩৯৫৬, মুসনাদে আহমাদ : ১৪০৬৯, বায়হাকী : ১৩৮৩৬।

১৫ সুনানে নাসাঈ : ৩৯৫৮।

এ থেকে স্পষ্ট নারীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মোটেও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না, বরং উল্টো ভালোবাসা ছিল।

সন্তান-সন্ততির ব্যাপারেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মোটেও নেতিবাচক ছিল না। অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার ব্যাপারে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন, অধিক সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম, এমন নারীকে বিয়ের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : 'তোমরা প্রেমময় অধিক প্রসবা নারীকে বিবাহ করো। কেননা আমি তোমাদের আধিক্য নিয়ে কিয়ামতের দিন গর্ব করবো।'[১৬] এ থেকে বোঝা যায়, নারী কিংবা সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা, তবে নেতিবাচক নয় মোটেও। বরং পরীক্ষা নেওয়া হয় উত্তম কিছুর মাধ্যমেই। সম্পদও এমন; উত্তম, কল্যাণময় তবে পরীক্ষার বস্তুও। কারণ সম্পদের রয়েছে অতুলনীয় আকর্ষণ ক্ষমতা। সম্পদ সম্পর্কে যাবতীয় সতর্কতা, যাবতীয় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি মূলত এই পরীক্ষাকে ঘিরেই।

ইমাম বুখারি (রহ.) বর্ণনা করেছেন,

> *'আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের ওপরে দরিদ্রতার আশঙ্কা করছি না বরং আশঙ্কা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় তোমাদের ওপরও দুনিয়া প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। ফলে তোমরা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে, যেমন তারাও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল। এটি তোমাদেরকে আখিরাত-বিমুখ করে ফেলবে, যেমন তাদেরকে বিমুখ করেছিল।'* [১৭]

সম্পদের প্রতি আকর্ষণ মানুষকে দ্বীনবিমুখ করবে, অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত করবে, হানাহানি-খুনোখুনির জন্ম দিবে, এ আশঙ্কায় সম্পদের ব্যাপারে নানা সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে, সম্পদকে কোথাও কোথাও তুচ্ছ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। মানুষের মন-মগজ যেন পার্থিব সম্পদের দিকেই কেবল নিবদ্ধ না হয়, এজন্য কুরআনুল কারিমের বিভিন্ন আয়াতে পার্থিব সম্পদকে হেয় করা হয়েছে, এর চেয়ে বরং আখিরাতের অশেষ ভাণ্ডারের দিকে দৃষ্টি ফেরানো হয়েছে। হাদিসের ভাণ্ডারেও এ ধরনের বিভিন্ন বর্ণনা স্থান পেয়েছে। মুহাদ্দিসগণ 'কিতাবুয যুহুদ' শিরোনামে এসকল বর্ণনাকে সংকলন করেছেন।

---

[১৬] মুসনাদে আহমাদ : ১৩৫৯৪; তাবরানী, মুজামুল আওসাত : ৫০৯৯; ইবনে হিব্বান : ৪০২৮; আবু দাউদ : ২০৫০; নাসাঈ : ৩২২৭।

[১৭] সহিহ বুখারি : ৩১৫৮।

এসকল বর্ণনার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, এগুলো কেবলই সতর্কতাস্বরূপ বর্ণিত হয়েছে, সম্পদের অনিষ্ট সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া এবং পার্থিব জীবনের চেয়ে আখিরাতের জীবনকে বড় করে দেখানোই এর উদ্দেশ্য। এগুলো কখনই সম্পদ সম্পর্কে ইসলামের মূল দৃষ্টিভঙ্গি নয়। সম্পদ সম্পর্কে নেতিবাচক যত বক্তব্য, তা পাঠ করতে হবে এ মূলনীতিকে সামনে রেখে যে, এসকল বর্ণনার উদ্দেশ্য কখনই সম্পদের সত্তাগত দোষ বর্ণনা করা নয়, বরং সম্পদের আহরণগত এবং ব্যবহারগত ত্রুটি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে দেওয়া। সম্পদের মোহে মানুষ দ্বীন-ধর্মকে বিসর্জন দেয়, সম্পদ ব্যবহার করতে গিয়ে সে আল্লাহর হুকুমের তোয়াক্কা করে না, এ ব্যাপারে সাবধান করে দেওয়া এবং দৃষ্টিকে পার্থিব জীবন থেকে ঘুড়িয়ে আখিরাতমুখী করে দেওয়াই যাবতীয় যুহুদ বিষয়ক বর্ণনার উদ্দেশ্য। এসকল বর্ণনা কখনই সম্পদের সত্তাগত গুরুত্বকে অস্বীকার করে না।

তিন

সাহাবাগণ ক্ষেত-খামারে কাজকর্ম করতেন কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। বলা যায়, সম্পদ অর্জনের পেছনে তারা যথেষ্ট সময় দিতেন। সম্পদ পেলে খুশি হতেন, সাধ্যমতো ব্যয় করতেন। সম্পদ-বিমুখ বৈরাগ্য জীবনকে তারা দ্বীন মনে করতেন না। এটিই ছিল সাধারণ চিত্র। বুখারির বর্ণনাটি লক্ষ করুন :

> *'একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু উবাইদা ইবনে জাররাহকে জিজিয়া আদায় করার জন্য বাহরাইন পাঠালেন। আবু উবাইদা (রা.) বাহরাইন থেকে মালামাল নিয়ে আসেন, আনসারগণ তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে ফজরের নামাজে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে শরিক হন। নামাজ শেষে তারা তাঁর সামনে এলেন। তিনি তাদের দেখে হেসে বললেন, আমি মনে করি তোমরা আবু উবাইদার আগমনের এবং সে যে সম্পদ নিয়ে এসেছে সে সংবাদ শুনেছ। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা এ সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং তোমরা আশা রেখো যা তোমাদের খুশি করবে।'*[১৮]

---

[১৮] সহিহ বুখারি : ৩১৫৮।

দেখুন, সম্পদের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কতটা স্বাভাবিক। সম্পদের খবর পেয়ে তারা ফজরেই দূরদূরান্ত থেকে এসে রাসূলুল্লাহর সাথে একই জামাতে শরিক হয়েছেন। সম্পদ পাওয়ার এ আগ্রহ দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) এতটুকুও বিরক্ত হননি, বরং হেসেছেন। সুসংবাদ দিয়েছেন, 'তোমরা আশা রেখো তোমাদের খুশি করবে'।

এখানে মনে রাখতে হবে, সাহাবাগণ সম্পদকে কখনই দ্বীনের ওপরে প্রাধান্য দেননি, সম্পদের মোহ কখনই তাদেরকে বিচ্যুত করতে পারেনি, বরং তারা সর্বদা আখিরাতকে দুনিয়ার ওপরে প্রাধান্য দিয়েছেন। তারা প্রচুর সম্পদ উপার্জন করেছেন, সাথে সাথে বিপুল পরিমাণ দান-সাদকাও করেছেন। কখনো কখনো দান করতে করতে নিজেকে খালি করে ফেলেছেন। তবে সংসার ফেলে পালিয়ে যাননি, সব বাদ দিয়ে মসজিদ-মাদরাসার খেদমতেও নিয়োজিত হননি। এটিই ছিল সাহাবাগণের সাধারণ চরিত্র। ইসলামের কারণে সাহাবাগণের সীমাহীন কষ্ট ও মুজাহাদার যে বর্ণনা আমরা পাই তা অধিকাংশই প্রথম যুগের ঘটনা, বিশেষ করে খাইবার বিজয়ের পূর্বের। পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে প্রাচুর্যও দিয়েছিলেন, এ ঘটনাগুলো সম্পর্কে আমরা অনেকেই বেখবর।

'কুরুনে সালাসা' অর্থাৎ ইসলামের প্রথম তিন যুগে সম্পদ সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি মোটেও নেতিবাচক ছিল না, বরং সৃষ্টিগত ফিতরাত অনুসারে সম্পদের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ, সাধ্যমতো সম্পদ আহরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবনাচারে সম্পদের স্বাভাবিক ও পরিমিত ব্যবহার ছিল সাধারণ চিত্র। প্রথম সংকলিত সহিহ সংকলন 'মুয়াত্তা'তে 'যুহুদ' বিষয়ে কোনো স্বতন্ত্র অধ্যায় দেখা যায় না, বরং 'সৌন্দর্যের জন্য কাপড় পরিধান করা' শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-একজনকে ছেঁড়া-ফাটা পোশাক পরিধান করতে দেখে আপত্তি করেছিলেন এবং তাকে ছেঁড়া-ফাটা কাপড় খুলে ভালো কাপড় পরিধান করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে কাপড় পরিবর্তন করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

> *তার কী হয়েছিল যে, কাপড় থাকতে সে তা পরিধান করল না? আল্লাহ তার গর্দান মারুক, এখন কি তাহাকে আগের চেয়ে ভালো দেখায় না!*[১৯]

এ অধ্যায়ে হযরত উমর (রা.)-এর একটি উপদেশও বর্ণনা করা হয়েছে, 'যখন তোমাদেরকে আল্লাহ সচ্ছলতা দান করবেন, তখন তোমরাও নিজের ওপর সচ্ছলতার নিদর্শন দেখাও, নিজেদের পোশাক তৈরি করে নাও।'[২০]

কুরুনে সালাসাকে বুঝতে মুয়াত্তার বর্ণনা বিশেষ গুরুত্ব রাখে। ইমাম মালেক (রহ.) মদিনাবাসীর আমল এবং মদিনার সামাজিক প্রচলনকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। মদিনায় প্রচলিত আমলের বিপক্ষে কোনো হাদিসকে তিনি গ্রহণ করতেন না। মুয়াত্তার পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, সাহাবা ও তাবেয়িগণের যুগে সাধ্যমতো উত্তম পোশাক পরিধান করার প্রচলন ছিল। ইমাম মালেক (রহ.) নিজেও জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করতেন। আবু উমাইয়া নামক একজন তাবেয়ি একবার দরবেশি পশমি পোশাক পরে বিখ্যাত তাবেয়ি আবুল আলিয়া (রহ.)-এর নিকটে গেলেন। তার দরবেশি পোশাক দেখে আবুল আলিয়া (রহ.) বলেন, 'এ তো খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীদের পোশাক। সাহাবাগণ একে-অপরকে দেখতে গেলে সুন্দর পোশাক পরিধান করতেন।'[২১]

উত্তম পোশাক পরিধান এবং সৌন্দর্যচর্চার ব্যাপারে বেশ কয়েকটি মারফু হাদিসও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমরা তোমাদের ভাইদের নিকটে যাওয়া-আসা করবে। কাজেই তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সুন্দর করবে এবং তোমাদের বাহন ও আবাসস্থল সুন্দর ও সুগোছালো করে রাখবে, যেন তোমরা সব মানুষের মধ্যে রাজতিলকের মতো উজ্জ্বল থাকতে পারো।'[২২] একবার একজন সুন্দর-সুবেশি লোক এসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, সৌন্দর্য এবং পারিপাট্য আমার খুব ভালো লাগে। আমি পছন্দ করি না যে, কেউ তার জুতার ফিতার সৌন্দর্যেও আমার ওপরে উঠুক,

---

[১৯] মুয়াত্তা : ১৬৮৭।

[২০] মুয়াত্তা : ১৬৮৯।

[২১] বুখারি, আদাবুল মুফরাদ : পৃ. ১২৭; আলবানী, সহিহুল আদাবিল মুফরাদ : পৃ. ১৪০।

[২২] মুস্তাদরাকে হাকিম : ৪/ ২০৩।

একি অহংকার বলে গণ্য হবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, না। অহংকার হলো সত্যকে অবজ্ঞা করা এবং মানুষকে হেয় বা ছোট ভাবা।'[২৩]

সম্পদ, পোশাক-পরিচ্ছদ, যানবাহন কিংবা বাসস্থানের ব্যাপারে এ ধরনের স্বাভাবিক স্বভাবজাত আচরণ ছিল কুরনে সালাসার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীতে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। মুসলিম সমাজ ক্রমান্বয়ে নগর জীবনে পদার্পণ করে। বড় বড় শহর প্রতিষ্ঠিত হয়, বড় বড় দালান-কোঠা নির্মিত হয়, জীবন হয় জাঁকজমকপূর্ণ। মানুষ বিশেষভাবে পার্থিব জীবনমুখী হয়ে ওঠে, তখন অর্থই হয়ে ওঠে যাবতীয় অনর্থের মূল। একসময় মরুর বুকে ক্ষুৎ-পিপাসার কষ্টে যে দ্বীন জন্ম নিয়েছিল, তারই অনুসারীরা নাগরিক জীবনে এসে হয়ে উঠেছিল পার্থিব ভোগবিলাসের দাস। এসময়ে তাদের মাঝে সেই দুনিয়া-বিমুখ চেতনাকে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন ছিল, যার প্রভাবে জন্ম নিয়েছিল ইসলামের প্রথম প্রজন্ম।

এসময়ের সংস্কারকগণ মানুষকে সম্পদ থেকে ফেরানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এজন্য তারা সম্পদের আনুষঙ্গিক ক্ষতি সম্পর্কে বর্ণিত কুরআনুল কারিমের আয়াত ও হাদিসসমূহকে ব্যাপকভাবে সামনে এনেছেন। হিজরি তৃতীয় শতকে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) 'কিতাবুয যুহুদ' নামে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। সমসাময়িক ও পরবর্তী সময়ে আরও অনেক মুহাদ্দিস 'কিতাবুয যুহুদ' শিরোনামে গ্রন্থ সংকলন করেন। জনপ্রিয় গ্রন্থগুলোর সংকলক হলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (মৃ. ১৮১ হি.), হাফিজ আবি হাতিম আর-রাযি (মৃ. ২৭৭ হি.), ইবনু আবি আসেম (মৃ. ২৮৭ হি.), ইমাম বায়হাকি (মৃ. ৪৫৮ হি.), খতিব আল-বাগদাদি (মৃ. ৪৬৩ হি.) প্রমুখ। ইমাম আহমাদ ও ইবনুল মুবারকের প্রায় সমসাময়িক সময়ে ইমাম বুখারি রহ. (মৃ. ২৫৬হি.) ও ইমাম মুসলিম রহ. (মৃ. ২৬১ হি.) তাদের সংকলনে 'কিতাবুয যুহুদ' নামে আলাদা অধ্যায় সংযোজন করেন। এ ব্যাপারে পরবর্তী মুহাদ্দিসগণও তাদেরকে অনুসরণ করেন। এসময়ে জামে, সুনান, মুসনাদ ও মুসান্নাফ সহ প্রায় সব ধরনের হাদিস সংকলনে যুহুদ-কেন্দ্রিক আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এভাবে হাদিসের গ্রন্থগুলোতে যুহুদ-কেন্দ্রিক আলোচনা বিস্তৃত হয়। তবে মুহাদ্দিসগণের নিকটেও যুহুদের অর্থ সম্পদ-বিমুখতা ছিল

---

[২৩] আবু দাউদ : ৪০৯২; মুস্তাদরাকে হাকিম : ২০২।

না। ইমাম আহমাদ (রহ.)-কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কী ধারণা, যে মসজিদে বা বাড়িতে কাজকর্ম না করেই বসে থাকে আর বলে, আমি কাজ করি না, আমার নিকটে বরং রিজিক আসে?' ইমাম আহমাদ (রহ.) সোজাসাপ্টা জবাব দেন, 'এই লোকটি জাহেল। সে ইলমের কিছুই জানে না। সেকি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ কথা শোনেনি যে, আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় রিজিক রেখেছেন তীর-বল্লমের ছায়ায়?'[২৪]

যুহুদকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেন সুফিগণ। প্রচণ্ড দুনিয়ামুখী সমাজকে তারা সজোরে ধাক্কা দেন যুহুদের বয়ান দিয়ে। তারা নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে আনেন : 'সম্পদ মাত্রই দায়িত্বের বোঝা, কাজেই বোঝা যত কম নেওয়া যায়, ততই ভালো।' পার্থিব ভোগ-বিলাসের পরিবর্তে তারা মানুষকে করেছেন প্রচণ্ড যুহুদমুখী। দ্বীনকে তারা অনেকটা যুহুদের সমার্থক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে ইমাম গাজালি (রহ.) সুফিগণের মুখপাত্র হিসেবে হাজির হয়েছেন। তার 'এহইয়াউ উলুমিদ্দীন', 'মিনহাজুল আবেদীন', 'মুকাশাফাতুল কুলুব' প্রভৃতি গ্রন্থ এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রচার-প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই পরবর্তীতে জনসাধারণের নিকটে, এমনকি সাধারণ আলেম সমাজেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সম্পদ সম্পর্কে সুফিগণের দৃষ্টিভঙ্গিই ইসলামি সমাজের মূলধারা হিসেবে গৃহীত হয়। আজও সাধারণ সমাজে এই দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রাধান্য দেখা যায়।

সম্পদের ব্যাপারে সুফিগণের যে দৃষ্টিভঙ্গি, তা ছিল একপ্রকার চিকিৎসা। পার্থিব জীবনমুখী মানুষকে আখিরাতমুখী করতে ঔষধ হিসেবে তারা 'যুহুদ'কে প্রয়োগ করেছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, পরবর্তীতে এই ঔষধই মূল খাদ্যে পরিণত হয়েছে, আর খাদ্য হয়েছে বিস্মৃত। এতে স্বাস্থ্যের যা হবার, তাই হয়েছে। সমাজের সব সম্পদ জমা হয়েছে ধর্মহীনদের হাতে, আর ধার্মিকরা হয়েছে তাদের অনুগত। এখন ধর্মকর্ম করতেও ধর্মহীনদের কাছে হাত পাততে হয়। মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ এবং পরিচালনা থেকে শুরু করে ইমাম, মুয়াজ্জিন, খতিবের বেতনের একটা বড় অংশ আসে সুদখোর-ঘুষখোর-দুর্নীতিবাজদের অর্থ থেকে। বড় বড় দ্বীনি মাদরাসা বন্ধ হয়ে যায় শুধু অর্থের অভাবে।

---

[২৪] ইবনে কুদামাহ, মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদীন : ৮৩।

অর্থের অভাবে কেবল প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হচ্ছে তা নয়, বরং ব্যক্তিত্বও ধ্বংস হচ্ছে। ইসলামপন্থিদের মধ্যে হীনম্মন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে। শুধু আর্থিক প্রাচুর্যের অভাবে সমাজের এলিট দ্বীনহীন ভদ্রলোকদের চোখে এই ইসলামপন্থিরা নিছক 'এতিমখানার লোক' হিসেবে পরিচিত হচ্ছে। তাদের একমাত্র পরিচয় দাঁড়িয়েছে, তারা 'এতিম'। রাষ্ট্রের চোখে তাদের শিক্ষাদর্শন 'এতিমের শিক্ষা দর্শন', তাদের রক্ত 'এতিমের রক্ত', তাদের অধিকার 'এতিমের অধিকার'। তারা 'মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন', রাষ্ট্র তাই করুণা করে তাদেরকে 'মূল ধারায় ফেরাতে' আসে, 'জাতে তুলতে' আসে। এসবের পেছনে বিরাট অংশে দায়ী আমাদের দারিদ্র্য। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চোখে এই স্বেচ্ছায় বরণ করে নেওয়া দরিদ্রতার কোনো মূল্য আছে কি? যখন ধর্মপ্রাণ মানুষের সম্পদ-বিমুখতা ও দরিদ্রতা খোদ দ্বীনকেই খাটো করে তুলছে, তখনও কি এই দারিদ্র্য প্রশংসার? আত্মহত্যার সাথে এই দৃষ্টিভঙ্গির তফাত কতটুকু?

ইবনুল কায়্যিম (রহ.)-এর একটি মন্তব্য আমাদেরকে সম্পদ-কেন্দ্রিক বিতর্কের উপসংহারে পৌঁছাতে সাহায্য করবে :

'সম্পদ যদি কেবল হাতেই থাকে, হৃদয়ে এর কোনো স্থান না থাকে, তাহলে তা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যদিও তা পরিমাণে অনেক বেশি হয়। আর সম্পদ যদি হৃদয়ে বসে যায়, তাহলে তোমার বিরাট ক্ষতি করে ছাড়বে, যদিও হাতে কিছুই না থাকে।'[২৫]

চার

বুহুদ ও ইসলামকে সমার্থক হিসেবে উপস্থাপন করার পেছনে অন্যতম দলিল হলো সাহাবাগণের অবস্থা এবং অর্থ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। 'কওলুস সাহাবাহ' বা সাহবাগণের অভিমত আমাদের জ্ঞানতত্ত্বের অন্যতম উৎস। তাদের কর্মপন্থা আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। এজন্য সাহাবাগণের আর্থিক জীবন সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা প্রয়োজন। দুঃখজনক হলেও সত্য, এ ব্যাপারে আমাদের দ্বীনি সমাজেও একপেশে ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাহাবাগণের প্রথম যুগের কষ্ট— মুজাহাদার ঘটনা এত বেশি আলোচিত হয়েছে যে, তাদের পরবর্তী প্রাচুর্যময় জীবনের গল্পগুলো পুরোপুরি হারিয়ে

---

[২৫] ইবনুল কায়্যিম, মাদারিজুস সালেকিন : ১/৪৬৩।

গেছে আমাদের সামনে থেকে। এ গল্পগুলোকে ইতিহাসের ধূলিমলিন পাতা থেকে পাঠকের সামনে তুলে এনেছেন আরিফুল ইসলাম ভাই। লেখক হিসেবে তার মুন্সিয়ানা সুপরিচিত। এ বইতে তিনি প্রসিদ্ধ কিছু সাহাবির ব্যবসা-জীবন এবং সম্পদ অর্জন ও বণ্টন সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। সিরাত, তাবাকাত ও তারীখের অনেকগুলো গ্রন্থ থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন সাহাবাগণের অর্থনৈতিক জীবনের বিশাল ফিরিস্তি। সনদের বিচারে কোনো কোনো তথ্য দুর্বল হলেও সামষ্টিকভাবে এ তথ্যগুলোকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। তারীখ ও মানাকিবের ক্ষেত্রে এধরনের বর্ণনা খুবই স্বাভাবিক। আর সাহাবাগণের পরবর্তী জীবনের অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের বিষয়টি ইতিহাস ও মানাকিবের গ্রন্থগুলোতে এতটাই প্রসিদ্ধ যে, নির্দিষ্ট কোনো বর্ণনা দিয়ে এটি প্রমাণ করার আবশ্যকতা নেই।

সাহাবাগণের গল্পকে লেখক বর্তমানের সাথেও মিলিয়ে দেখেছেন। সেখান থেকে শিক্ষা বের করেছেন বর্তমান সময়ের জন্য। কোথাও আবার বর্তমান প্রেক্ষাপটকে হাজির করেছেন সাহাবাগণের প্রেক্ষাপটকে বোঝতে। বইটিতে সাহাবাগণের সম্পদের যে পরিমাণ দেখানো হয়েছে, তা ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে। যেমন ধরুন, সে যুগের ৮০০ দিরহাম, বতর্মান সময়ের কত টাকা? লেখক হিসেব করেছেন : 'সেই যুগে ৮০০ দিরহাম দিয়ে প্রায় ৬০টি ভেড়া কেনা যেত। বর্তমানে একটি ভেড়ার দাম ১০,০০০ টাকা হলে সেই জামানায় দাম হয় প্রায় ৬ লক্ষ টাকা।' এ হিসাবের উদ্দেশ্য সম্পদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তুলে ধরা নয়, বরং সম্পদের পরিমাণ সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা প্রদান করা। এ থেকে পাঠক সে যুগের সম্পদের পরিমাণকে বর্তমানের সাথে অনেকাংশে মিলিয়ে নিতে পারবেন। এতে সাহাবাগণের অর্থনৈতিক জীবন অনেকটা স্বচ্ছভাবে ধরা দিবে পাঠকের কাছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সব মিলিয়ে বইটি সুপাঠ্য হবে।

সাহাবাগণের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে প্রচলিত একপেশে বয়ানকে অনেকাংশে পাল্টে দিবে এ বই, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা পাঠককে এ থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং লেখককে উত্তম বিনিময় দান করুন।

মুজাজ্জাজ নাঈম
বড়াইগ্রাম, নাটোর।

ব্যবসার প্রতি রাসূল (সা.) এবং সাহাবিদের উৎসাহবাণী

"তোমরা পার্থিব জীবনোপকরণ লাভে উত্তম পন্থা অবলম্বন করো। কেননা যাকে যেজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা তার জন্য সহজতর করা হয়েছে।"

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন ব্যবসায়ীর সন্তান। তিনি নিজে ব্যবসা করেন। চাচার সাথে ব্যবসায়িক সফরে সিরিয়ায় যান, যৌবনে আবার পণ্য নিয়ে সিরিয়ায় যান ব্যবসা করতে। মানুষকে কাজ করে খাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি বলেন:

> *"মানুষের নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর কিছু নেই।"*[১]

কেউ যদি বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা করে, এই ব্যবসার জন্যও সে সওয়াব পাবে। সে ব্যবসা করে মুনাফা লাভ করে, সেখান থেকে পরিবারের পেছনে ব্যয় করবে, এতেও সওয়াব রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

> *"বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে থাকবে।"*[২]

---

১ সহিহ বুখারি: ২০৭২।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন:

> *"বিধবা ও নিঃস্বদের জন্য উপার্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তির সমতুল্য এবং যারা রাতে (নফল) ইবাদত করে ও দিনে রোজা রাখে তাদেরও সমতুল্য।"*[৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, ব্যবসা করা বা উপার্জন করাটাও একটা ইবাদত; যদি সেটা ইসলামের বিধান অনুসারে হয়।

একজন ভালো মানুষের কাছে সম্পদ থাকা দোষের কিছু না, বরং ক্ষেত্রবিশেষে সেটা উত্তম। সম্পদের মাধ্যমে সে অন্যদের উপকার করতে পারে। দান করতে পারে, অভাবগ্রস্তকে সহযোগিতা করতে পারে, ঋণগ্রস্তকে টাকা দিয়ে তার দুশ্চিন্তা দূর করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

> *"তাকওয়ার অধিকারী লোকদের ধন-সম্পদের মালিক হওয়াতে কোনো দোষ নেই।"*[৪]

একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবি আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন,

> *"আমি তোমাকে সম্পদ উপার্জনের জন্য উৎসাহ দিচ্ছি। সৎ মানুষের হাতে হালাল সম্পদ থাকা অতি উত্তম। তা দিয়ে সে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।"*[৫]

কোনো উপায়ে কারো রিজিকের ব্যবস্থা হলে সে যেন ঐ পেশায় লেগে থাকে। এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎসাহ দেন।

নাফে রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি সিরিয়া ও মিসরে ব্যবসায়িক পণ্য রপ্তানি করতাম। আমি ইরাকে পণ্য রপ্তানির মনস্থ করে উম্মুল

---

২ সুনানে ইবনে মাজাহ: ২১৩৯।

৩ প্রাগুক্ত, ২১৪০।

৪ প্রাগুক্ত, ২১৪১।

৫ মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২; ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহর শর্তে সহিহ।

মুমিনিন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট গিয়ে বললাম, হে উম্মুল মুমিনিন! আমি সিরিয়ায় পণ্য রপ্তানি করতাম, এবার ইরাকে তা রপ্তানি করতে চাই। তিনি বলেন, তুমি তা করো না, তোমার আগের গন্তব্য ঠিক রাখো। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ কোনো স্থান থেকে তোমাদের কারো রিজিকের ব্যবস্থা করে দিলে সে যেন ঐ স্থান ত্যাগ না করে, যতক্ষণ না সেই স্থান তার প্রতিকূল হয় অথবা অসহনীয় হয়।"[৬]

সাহাবিগণ যেন ব্যবসা করেন সেই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎসাহ দিয়ে বলেন,

> *"তোমরা ব্যবসা করো। কেননা, রিজিকের দশভাগের নয়ভাগ ব্যবসার মধ্যে রয়েছে।"*[৭]

চার খলিফার প্রত্যেকেই অন্যান্য কাজের পাশাপাশি উপার্জনে সময় দেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ব্যবসায়ী। খিলাফতের দায়িত্ব লাভের আগ পর্যন্ত তিনি ব্যবসা করতেন। খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পর উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শে তাঁর জন্য বার্ষিক ২৫০ দিনার ভাতা ধার্য করা হয়। কিন্তু, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর ইচ্ছে ছিল তিনি ব্যবসা করবেন, নিজ হাতে উপার্জন করবেন।

খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পর তিনি তাঁর সমস্ত দিনার এবং দিরহাম বায়তুলমালে জমা দেন এবং বলেন, "আমি এগুলো দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতাম। কিন্তু, যখন খিলাফতের দায়িত্ব নিলাম, তখন লোকেরা আমাকে ব্যবসা ও রুটি-রোজগার থেকে সরিয়ে নিলো।"[৮]

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন চামড়ার ব্যবসায়ী। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে বড়

---

৬ সুনানে ইবনে মাজাহঃ ২১৪৮।

৭ আল্লামা ইরাকী, তাখরিজু আহাদিসি এহইয়াঃ ১৫৮৮।

৮ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহদঃ ২/২১।

ব্যবসায়ী। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুও নিজে উপার্জন করতেন। এমনকি একবার তিনি এক ইহুদির কাজে নিজেকে ভাড়ায় খাটিয়েছিলেন।[৯]

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হবার পর মানুষজনকে ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি ব্যবসায়ীদের জন্য মূলনীতি প্রণয়ন করেন। তিনি বাজারে নিয়ম করেন—"ইসলামি শরিয়তে ক্রয়-বিক্রয় নীতিমালা সম্পর্কে যারা পুরোপুরি অভিজ্ঞ, তারাই ব্যবসা করার অনুমতি পাবে।"[১০]

তাঁর যুগে ব্যবসা সম্পর্কে জ্ঞান ছাড়া কেউ ব্যবসা করতে পারত না। এটাকে বলা যায় সার্টিফিকেটের মতো। ব্যবসা করতে হলে ব্যবসায়িক জ্ঞান প্রয়োজন। এটা এই কারণে যে, এই নিয়ম না থাকলে ব্যবসায়ী বুঝতে পারবে না কোনটা হালাল আর কোনটা হারাম। কেননা, ব্যবসায়ে হালাল-হারাম খুবই সূক্ষ্ম বিষয়। এই বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকলে যে কেউ হারামে লিপ্ত হতে পারে।

মানুষের কাছে ভিক্ষা করার চেয়ে এমন কোনো ব্যবসা করা উত্তম, যা মানুষের কাছে তুচ্ছ। যেমন—রাস্তার পাশে ঝালমুড়ির ব্যবসা। উমর ইবনুল খাত্তাব তাঁর যুগের মানুষদেরকে ব্যবসার প্রতি উৎসাহ দেন। তিনি বলেন:

> *"হে দুস্থের দল! মাথা তোলো, ব্যবসা করো। পথ উন্মুক্ত। মানুষের ওপর বোঝা হয়ো না।"*[১১]

একদিন বাজারে প্রবেশ করে দেখলেন বেশিরভাগ ব্যবসায়ী বাইরের। প্রবীণ সাহাবিরা ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে। এটা দেখে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তৎক্ষণাৎ প্রবীণ ব্যবসায়ীদেরকে জড়ো করলেন। তারা কেন ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে জানতে চাইলেন। অতঃপর তিনি সবার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন:

---

৯ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী, কিতাবুল কাসব: ৩৬।

১০ ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবি, উমর ইবনুল খাত্তাব: ১/৩৫৫।

১১ প্রাগুক্ত, ১/৩৫৬।

> *"আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি এমনটা করতে থাকো, তাহলে তোমাদের পুরুষ তাদের (অনারব) পুরুষের এবং তোমাদের নারীরা তাদের (অনারব) নারীদের অধীনস্থ হয়ে পড়বে।"*[১২*]

মুজাহিদ ব্যতীত অন্যান্য বিশিষ্ট মুসলিম ব্যবসায়ী ব্যবসা ছেড়ে দিলে তিনি সেটাকে শঙ্কার দৃষ্টিতে দেখতেন।

---

১২ ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবি, উমর ইবনুল খাত্তাব: ১/৩৫৬।

* উমরা রা. বাজারে নাবাতীদের আধিক্য দেখে এ কথা বলেছিলেন। তারাও ছিলেন আরব, দক্ষিণ আরবের অধিবাসী। এজন্য অনারবদের অধীনতার কথা বলা হয়নি।

তৎকালীন আরবের ১২টি বাজার

"কেউ যদি তার ভাইকে ঋণ দেয়, তবে যতদিন তা সে গ্রহণ করবে না, ততদিন তা সাদকা হিসেবে তার কাছে থাকবে।"

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

মক্কার লোকজনের উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম ছিল ব্যবসা। তারা বিভিন্ন সময় ব্যবসায়িক সফরে সিরিয়া, ইয়েমেনে যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ব্যবসায়িক সফরে সিরিয়া যান। একবার যান বাল্যকালে চাচা আবু তালিবের সাথে, আরেকবার যান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে।

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের বাবা ছিলেন হাশিম ইবনে আব্দে মানাফ। তিনি ব্যবসায়িক সফরে সিরিয়ায় যান এবং সেই সফরে ইন্তেকাল করেন।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাবা আব্দুল্লাহও ব্যবসায়িক সফরে ইন্তেকাল করেন।

দুজনই যেখানে ইন্তেকাল করেন, সেখানে তাদেরকে দাফন করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সেই রক্তধারার উত্তরাধিকারী, যার বাবা এবং পরদাদা ব্যবসা করতে গিয়ে প্রবাসে ইন্তেকাল করেন।

কুরাইশরা বছরে মূলত দুটো বড় বাণিজ্যিক সফরে যেত। শরৎকালে তারা যেত সিরিয়ায়, শীতকালে ইয়েমেনে।[১]

তাছাড়া কুরাইশরা তিনটি বাজার নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করত। যেগুলো ছিল—উকাজ, মাজান্নাহ, যুল-মাজায।[২] এই বাজারগুলো সাধারণত হজের সময় বসতো। জাহিলি যুগেও মক্কায় হজ হতো, হজের উদ্দেশ্যে মানুষজন মক্কায় আগমন করত। কুরাইশরা এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে ব্যবসা করত।

বর্তমান সময়ের মতো সেই যুগে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বাজার সারাবছর থাকত না। বাজারগুলো ছিল মেলার মতো। একমাস বা পনেরো দিন এক জায়গায় বাজার বসতো, তারপর সেই বাজার অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হতো। এভাবে ব্যবসায়ীরা সারাবছর আরবের বিভিন্ন স্থানে ব্যবসা করত।

তৎকালীন আরবে যেসব বাজার ছিল, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো:

১. দুমাতুল জান্দাল:

দুমাতুল জান্দাল ছিল জাহেলি আরবের বিখ্যাত বাজার। এটি জাওফ এলাকায় অবস্থিত। রবিউল আউয়ালের ১ তারিখ থেকে মেলা বসতো, পনেরো দিন পর্যন্ত মেলাটি চলত। মেলাটি নিয়ন্ত্রণ করত কালব এবং গাসসান গোত্র।[৩]

---

১ Irfan Shahid, Exploring trade practice and market before and after the advent of Islam in Arabia, Page 5.

২ Ibid, Page 10.

৩ Ibid, Page 10.

২. আল-মুশাক্কার বাজার:

এই বাজার বসতো হাজরের দুর্গে। জুমাদাস সানি মাসে বাজারটি বসতো এবং পারস্যের ব্যবসায়ীরা সাগর পাড়ি দিয়ে এই বাজারে আসত।[৪]

৩. হাজার বাজার:

রবিউস সানি মাসে এই বাজার বসতো। বাহরাইনের রাজা আল-মুনজির ইবনে সাওয়াহ ছিলেন এই বাজারের নিয়ন্ত্রক। খেজুরের জন্য বিখ্যাত এই বাজারে ভারত এবং পারস্যের ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য নিয়ে আসত।[৫]

৪. ওমান বাজার:

ওমানের বাজারে আরব ব্যবসায়ীরা যেত হাজরের বাজারের বেচা-বিক্রি শেষ করে। এটা ছিল জাহেলি আরবের অন্যতম পুরনো বাজার।[৬]

৫. সুহর বাজার:

সুহর বাজার ছিল আরবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাজার। এই বাজারে আরবের পূর্বাঞ্চলের পণ্য আসত বলে আরবদের কাছে বাজারটির গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল। রজব মাসের ১-৫ তারিখের মধ্যে বাজার বসতো, শেষ হতো ২০ রজব।[৭]

---

৪ Irfan Shahid, Exploring trade practice and market before and after the advent of Islam in Arabia, Page 10.

৫ Ibid, Page 10.

৬ Ibid, Page 11.

৭ Ibid, Page 11.

৬. দিবা বাজার:

ওমানের পূর্বাঞ্চলে এই বাজার অবস্থিত ছিল। রজব মাসের শেষে এই বাজার শুরু হতো।[৮]

৭. হুবাশাহ বাজার:

তিহদামা অঞ্চলে এই বাজার অনুষ্ঠিত হতো। আরবের পশ্চিমাঞ্চলের পণ্য হুবাশাহ বাজারে পাওয়া যেত। রজব মাসে অনুষ্ঠিত বাজারে হিজাজ এবং ইয়েমেন থেকে ব্যবসায়ীরা অংশগ্রহণ করত।[৯]

৮. আল-সিহর বাজার:

দিবা বাজারের কার্যক্রম শেষে ব্যবসায়ীরা সিহর বাজারে পৌঁছাত।[১০]

৯. আদন বাজার:

রমজান মাসের প্রথমদিন থেকে এই বাজার শুরু হতো। এই বাজার ছিল সুগন্ধীর জন্য বিখ্যাত। বাজারটি দশদিন ধরে চলত। কর ব্যবস্থার শিথিলতার কারণে বাজারে বিক্রেতারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত।[১১]

---

৮ Irfan Shahid, Exploring trade practice and market before and after the advent of Islam in Arabia, Page 11.

৯ Ibid, Page 11.

১০ Ibid, Page 11.

১১ Ibid, Page 11..

২. আল-মুশাক্কার বাজার:

এই বাজার বসতো হাজরের দুর্গে। জুমাদাস সানি মাসে বাজারটি বসতো এবং পারস্যের ব্যবসায়ীরা সাগর পাড়ি দিয়ে এই বাজারে আসত।[৪]

৩. হাজার বাজার:

রবিউস সানি মাসে এই বাজার বসতো। বাহরাইনের রাজা আল-মুনজির ইবনে সাওয়াহ ছিলেন এই বাজারের নিয়ন্ত্রক। খেজুরের জন্য বিখ্যাত এই বাজারে ভারত এবং পারস্যের ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য নিয়ে আসত।[৫]

৪. ওমান বাজার:

ওমানের বাজারে আরব ব্যবসায়ীরা যেত হাজরের বাজারের বেচা-বিক্রি শেষ করে। এটা ছিল জাহেলি আরবের অন্যতম পুরনো বাজার।[৬]

৫. সুহর বাজার:

সুহর বাজার ছিল আরবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাজার। এই বাজারে আরবের পূর্বাঞ্চলের পণ্য আসত বলে আরবদের কাছে বাজারটির গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল। রজব মাসের ১-৫ তারিখের মধ্যে বাজার বসতো, শেষ হতো ২০ রজব।[৭]

---

৪ Irfan Shahid, Exploring trade practice and market before and after the advent of Islam in Arabia, Page 10.

৫ Ibid, Page 10.

৬ Ibid, Page 11.

৭ Ibid, Page 11.

৬. দিবা বাজার:

ওমানের পূর্বাঞ্চলে এই বাজার অবস্থিত ছিল। রজব মাসের শেষে এই বাজার শুরু হতো।[৮]

৭. হুবাশাহ বাজার:

তিহদামা অঞ্চলে এই বাজার অনুষ্ঠিত হতো। আরবের পশ্চিমাঞ্চলের পণ্য হুবাশাহ বাজারে পাওয়া যেত। রজব মাসে অনুষ্ঠিত বাজারে হিজাজ এবং ইয়েমেন থেকে ব্যবসায়ীরা অংশগ্রহণ করত।[৯]

৮. আল-সিহর বাজার:

দিবা বাজারের কার্যক্রম শেষে ব্যবসায়ীরা সিহর বাজারে পৌঁছাত।[১০]

৯. আদন বাজার:

রমজান মাসের প্রথমদিন থেকে এই বাজার শুরু হতো। এই বাজার ছিল সুগন্ধীর জন্য বিখ্যাত। বাজারটি দশদিন ধরে চলত। কর ব্যবস্থার শিথিলতার কারণে বাজারে বিক্রেতারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত।[১১]

---

৮ Irfan Shahid, Exploring trade practice and market before and after the advent of Islam in Arabia, Page 11.

৯ Ibid, Page 11.

১০ Ibid, Page 11.

১১ Ibid, Page 11..

১০. সানা বাজার:

সানা বাজার শুরু হতো রমজান মাসের মাঝামাঝিতে। রমজান মাসের শেষ দিনগুলোতে এই বাজারে পণ্য কেনা-বেচা হতো। এই বাজারে চামড়া, তুলা, রং বিক্রি হতো। পোশাক শিল্পের সাথে যারা জড়িত ছিল, তারা পণ্য কিনতে সানা বাজারে যেত।[১২]

১১. উকাজ বাজার:

উকাজ বাজার ছিল আরবের সবচেয়ে বিখ্যাত বাজার। এটা ছিল জাজিরাতুল আরবের সবচেয়ে বড় বাজার। এই বাজারে শুধু পণ্য বিক্রয় হতো না, আরবের কাছে এই বাজারের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ছিল। মেলার সময় এখানে কবিতা প্রতিযোগিতা হতো। এই বাজার ছিল ট্যাক্স ফ্রি। ফলে, ব্যবসায়ীরা উকাজ বাজারে পণ্য বিক্রি করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। মদ, ঘি, পোশাকের জন্য এই বাজার বিখ্যাত ছিল। হাজর, ইরাক, গাজা, বসরা, ইয়েমেন থেকে ব্যবসায়ীরা উকাজ বাজারে পণ্য নিয়ে আসত।[১৩]

---

১২ Irfan Shahid, Exploring trade practice and market before and after the advent of Islam in Arabia, Page 11.

১৩ Ibid, Page 11.

১২. মাজান্নাহ বাজার:

উকাজ মেলা শেষ হবার পর ব্যবসায়ীরা মাজান্নাহ বাজারে পণ্য নিয়ে যেত। এই বাজার বসতো জিলক্বদের শেষ দশদিন। মদপ্রেমীদের জন্য মাজান্নাহ বাজার বিখ্যাত ছিল।[১৪]

---

১৪ Ibid, Page 12.

সাহাবিদের যুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

"একসময় আমি ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বাঁধতাম। অথচ আজ আমার সাদকার পরিমাণ ৪০০০ দিনার!"

-আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত লাভের পূর্বে কুরাইশরা বাণিজ্যিক সফরে সিরিয়া, ইয়েমেন যেত। রাসূলুল্লাহ নিজেও বাণিজ্যিক সফরে যান। সাহাবিরাও ব্যবসা করার জন্য বিদেশে যান।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় মুসলিম ভূখণ্ডে আমদানি-রপ্তানি অনেক বেড়ে যায়। সাহাবিগণ ব্যবসার উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে যেতেন, অমুসলিমরাও ব্যবসা করতে মুসলিম ভূখণ্ডে আসত।

ব্যবসায়ী সাহাবিগণ লক্ষ করলেন, তারা যখন অমুসলিম ভূখণ্ডে যান, সেখানে তাদেরকে শুল্ক দিতে হতো। ১০% হারে শুল্ক ধার্য করা হতো।

মানবিজ এবং বাহরে আদনের অধিবাসীগণ ব্যবসা করতে আরব উপদ্বীপে আসে। তারা খলিফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রস্তাব দেয় যে, আরব ভূখণ্ডে ব্যবসা করার জন্য বাণিজ্যিক শুল্ক প্রদান করবে।[১]

সেই যুগে যারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবি উসমান ইবনে হুনাইফ রাদিয়াল্লাহু আনহু। উমর

---

১ ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবি, উমর ইবনুল খাত্তাব, ২/৪৭।

ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "অমুসলিম দেশে ব্যবসা করতে গেলে তারা আমাদের কাছ থেকে এক-দশমাংশ শুল্ক নেয়।"

একথা শুনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও নির্দেশ দিলেন, "আমরাও তাহলে এক-দশমাংশ শুল্ক ধার্য করব।"[২]

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই উদ্যোগের ফলে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে মুসলিম ভূখণ্ডে পণ্য আমদানি শুরু হয়। যার ফলস্বরূপ মুসলিম-অমুসলিম ব্যবসায়ী পৃথিবীর নানান অঞ্চলে ব্যবসা করার সুযোগ পায়। মুসলিমরাও অমুসলিম দেশগুলোতে পণ্য রপ্তানি করে।[৩]

মুসলিম ভূখণ্ডের বন্দরগুলোতে ভারত, চীন এবং পূর্ব আফ্রিকা থেকে পণ্য আসা শুরু হয়। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শুল্ক আদায়ের জন্য কাস্টমস অফিসার নিয়োগ দেন।[৪]

---

২ ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবি, উমর ইবনুল খাত্তাব, ২/৪৭।

৩ ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবি, উমর ইবনুল খাত্তাব, ২/৪৮।

৪ ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবি, উমর ইবনুল খাত্তাব, ২/৪৮।

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু

"ব্যয় করো এবং দান করো। 'অনেক সম্পদ হলে দান করব' —এমনটা ভেবো না। তাহলে দেখবে, সম্পদও হবে না, দান করাও হবে না। অনেক সম্পদ না থাকা সত্ত্বেও যদি দান করো, তাহলে তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না।"

-আসমা বিনতে আবি বকর (রা.)

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে নিজের দুই মেয়ে রুকাইয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে দেন। রুকাইয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকালের পর তিনি বিয়ে করেন উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহাকে। তিনিও ইন্তেকাল করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "উসমান, আমার তৃতীয় (বিয়ের উপযুক্ত) একজন কন্যা থাকলে, তাঁকেও তোমার সাথে বিয়ে দিতাম।"[১]

সেই সময় রাসূলুল্লাহর বাকি দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। নতুবা তাঁদের কেউ অবিবাহিত থাকলে তাঁকেও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বিয়ে দিতেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সেসব সৌভাগ্যবান সাহাবিদের অন্যতম, যারা দুনিয়ায় থাকাবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেন।[২]

---

১ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/৪১।

২ জামে' তিরমিজি: ৩৭৪৭

একবার উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে প্রবেশ করলে রাসূলুল্লাহ উঠে বসে কাপড় ঠিক করে নিলেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে এমনটা করার কারণ জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> *"আমি কি সেই লোককে লজ্জা করব না, যাকে দেখে ফেরেশতারা পর্যন্ত লজ্জা পায়?"*[৩]

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ব্যবসায়ী সাহাবি। সাহাবিদের মধ্যে যারা ধনী ছিলেন, তাঁদের শীর্ষে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান। তাঁকে ডাকা হতো 'উসমান গনি' বা বিত্তবান উসমান, ধনী উসমান।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কেমন সম্পদ ছিল, সেটা বুঝা যায় তাঁর দানের পরিমাণ থেকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় যেসব সাহাবি ইসলামের জন্য সবচেয়ে বেশি দান করেন, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবার শীর্ষে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দানের ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. বি'রে রুমা:

সাহাবিরা মদিনায় হিজরত করলে সেখানে পানির সংকট দেখা দেয়। খাবার পানির জন্য অন্যতম উৎস ছিল রুমার কূপ। কিন্তু, সেই কূপের পানি চড়ামূল্যে বিক্রি করত কূপের মালিক।

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

> *"যে ব্যক্তি রুমার কূপটি খনন করে দিবে, সে জান্নাতি।"*[৪]

---

৩ সহিহ মুসলিম: ৬১০৩।

৪ সহিহ বুখারি: ২৭৭৮।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বান শুনে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু রুমার কূপটি ৩৫,০০০ দিরহামের বিনিময়ে কিনে ধনী-গরিব সবার জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন।[৫]

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওয়াক্‌ফকৃত কূপ থেকে সবাই পানি খেতে পারত। আগে কিনে পানি খেতে হতো, ওয়াক্‌ফ করার পর সবাই বিনা মূল্যে পানি খেতে পারত।

২. মসজিদে নববির সম্প্রসারণ:

মসজিদে নববিতে আগত মুসল্লির সংখ্যা বাড়তে থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

> *"অমুক গোত্রের জমি কিনে কে সেটা মসজিদের সাথে সংযুক্ত করবে? (এতে) আল্লাহ তাকে জান্নাতে এরচেয়ে উত্তম প্রতিদান দান করবেন।"*[৬]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বান শুনে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ২০,০০০ দিরহামের বিনিময়ে জায়গা কিনে মসজিদ সম্প্রসারণ করেন।

৩. তাবুক যুদ্ধে:

তাবুক যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনীর আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সকল সাহাবিকে আর্থিক সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানান। সাহাবিরা নিজেদের সামর্থ্যানুযায়ী সহযোগিতা করেন। যার একেবারে সামর্থ্য ছিল না, তিনি সামান্য খেজুর দিয়ে হলেও অংশগ্রহণ করেন।

---

৫ সহিহ বুখারি: ২৭৭৮, ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবি, উসমান ইবনে আফফান, পৃষ্ঠা ৮৮।

৬ জামে' তিরমিজি: ৩৭০৩।

তাবুক যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ আর্থিক সহযোগিতা করেন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু। তাবুক যুদ্ধে তাঁর সহযোগিতা ছিল নিম্নরূপ:

- উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ৯৪০টি উট দান করেন
- ৬০টি ঘোড়া দান করেন
- ১০,০০০ দিনার দান করেন।[৭]

তাঁর এমন দানের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্তব্য করেন,

> *"আজকের পর থেকে উসমান যাই করুক, তার জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে না।"*[৮]

৪. দুর্ভিক্ষের সময়:

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে একবার অনাবৃষ্টির দরুন দুর্ভিক্ষ হয়। চারিদিকে খাদ্য সংকট। মানুষজন অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যবসায়িক কাফেলা মদিনায় পৌঁছে ১০০ উট বোঝাই পণ্য নিয়ে।

মদিনার ব্যবসায়ীরা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে জড়ো হয়। তারা বলে তাদের কাছে পণ্য বিক্রি করতে। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি পণ্য বিক্রি করেন, খুচরা ব্যবসায়ীরা বেশ লাভবান হবে। তারা চাইলে পণ্যের দাম একটু বাড়িয়ে বিক্রি করতে পারবে। চারিদিকে যেহেতু খাদ্যের সংকট, মানুষজন দামের দিকে তাকাবে না।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে কত লাভ দিবে?"

ব্যবসায়ীরা বলল, "দশের বিনিময়ে বারো।"

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাজি হলেন না। ব্যবসায়ীরা দাম বাড়িয়ে বলল—"দশের বিনিময়ে পনেরো।"

---

৭ ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবি, উসমান ইবনে আফফান, পৃষ্ঠা ৮১।

৮ জামে' তিরমিজি: ৩৭০০।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "তোমরা কি দশের বিনিময়ে একশো দিতে পারবে?"

অর্থাৎ দশগুণ বেশি দাম। যে পণ্য তিনি ১০০ টাকায় কিনেছেন, সেটা ১০০০ টাকায় বিক্রি করতে চাচ্ছেন। ব্যবসায়ীরা বেশ অবাক হলো। কারণ, এত দাম দিয়ে পণ্য কিনে তারা বিক্রি করবে কীভাবে?

অতঃপর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "তাহলে যিনি আমাকে দশের বিনিময়ে একশো দিতে পারবেন, তার কাছে আমি পণ্য বিক্রি করব।"

ব্যবসায়ীরা হাল ছেড়ে দিলো। তারা ভেবে পাচ্ছিল না মদিনায় কোন এমন ব্যবসায়ী আছেন, যিনি দশগুণ বেশি দামে পণ্য কিনবেন?

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আমি আমার সমস্ত পণ্য গরিব মুসলমানদেরকে দান করে দিলাম।"[৯]

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যেমন ধনী ছিলেন, তেমনি ইসলামের সেবায় অকাতরে দান করতেন। তাঁর দানকৃত অর্থের পরিমাণ বর্তমান সময়ের আলোকে গণনা করলে দেখা যাবে সেটা কয়েকশো কোটি টাকা হবে!

ইসলাম গ্রহণের পর প্রতি শুক্রবার তিনি একজন দাস মুক্ত করতেন। তিনি মোট ২৪০০ জন দাস মুক্ত করেন![১০]

সামষ্টিক কল্যাণে যেমন তিনি এগিয়ে যেতেন, তেমনি কারো ব্যক্তিগত প্রয়োজনে দু'হাত বাড়িয়ে দিতেন।

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন ব্যবসায়ী, তাঁর বন্ধু। একবার তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঋণের প্রয়োজন হয়। তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ৫০ হাজার দিরহাম ধার নিলেন, যা টাকার অঙ্কে কয়েক কোটি টাকা।

---

৯ ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবি, উসমান ইবনে আফফান, পৃষ্ঠা ১০০।

১০ ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবি, উসমান ইবনে আফফান, পৃষ্ঠা ১৮২।

ধার পরিশোধের সময় হলে তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আপনার টাকা রেডি আছে। আপনি চাইলে নিতে পারেন।"

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "এগুলো লাগবে না। আপনাকে আমি গিফট দিলাম।"[১১]

দানশীলতা, উদারতা, মহানুভবতার গুণাবলি ছিল উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বৈশিষ্ট্য।

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন বেশ সৌখিন। সাহাবিরা শুধুমাত্র তালিযুক্ত জামা পরতেন না। যেসব সাহাবির সামর্থ্য ছিল, তারা ভালো মানের জামাও পরতেন। কোনো সাহাবি দামি জামা পরলে অন্যরা জিজ্ঞেস করতেন—এটা কোন জায়গা থেকে এসেছে? দাম কত?

একবার উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি ভালো জামা পরে বের হলেন। সবাই তাঁকে জিজ্ঞেস করল—এটা কোন জায়গার জামা? কত দিয়ে কিনেছেন?

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু জানান—এটা ইয়েমেন থেকে এসেছে, দাম ৮০০ দিরহাম।[১২]

সেই যুগে ৮০০ দিরহাম দিয়ে প্রায় ৬০টি ভেড়া কেনা যেত। বর্তমানে একটি ভেড়ার দাম ১০,০০০ টাকা হলে সেই জামাটির দাম হয় প্রায় ৬ লক্ষ টাকা।

সাহাবিগণ তাদের স্ত্রীদের কাপড়ের ব্যাপারে বেশ উদার ছিলেন। সাহাবিরা তাদের স্ত্রীদেরকে কেমন কাপড় পরতে দিতেন এই ব্যাপারে পরবর্তী প্রজন্ম বেশ গুরুত্বের সাথে কাপড়ের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন।

সাহাবিরা যখন তাদের স্ত্রীদের কাপড় দিতেন, তখন দুটো বিষয় লক্ষ রাখতেন। পোশাকটি তাদেরকে উত্তমরূপে সুরক্ষা দিবে এবং সেটা পরলে তাদেরকে সুন্দর লাগবে।

---

১১ ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবি, উসমান ইবনে আফফান, পৃষ্ঠা ১৮২

১২ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/৪২।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর স্ত্রী নাইলাকে ২০০ দিরহাম মূল্যের একটি জামা দেন। বর্তমান সময়ের তুলনায় জামাটির মূল্য লক্ষাধিক টাকা!

সেই সময় অনেক ইউনিসেক্স জামা পাওয়া যেত; এক জামা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই পরতে পারতেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু স্ত্রীকে যে জামা উপহার দেন, সেই জামাটি তিনি নিজেও পরেন।

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, "আপনি কেন এই জামাটি পরছেন?"

তিনি বলেন, "আমার স্ত্রী আমাকে এই জামা পরাবস্থায় দেখলে অনেক খুশি হবে। তাঁকে খুশি করার জন্যই আমি জামাটি পরেছি।"[১৩]

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পূর্বে তাঁর সম্পদের পরিমাণ ছিল:

- ৩ কোটি দিরহাম
- ৫ লক্ষ দিনার।[১৪]

ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর কাছে যত সম্পত্তি ছিল, সেগুলোকে অর্থের ক্রয়ক্ষমতার আলোকে হিসেব করলে দেখা যায় তাঁর সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায়—৩ হাজার কোটি টাকা!

তাঁকে যখন হত্যা করা হয়, তাঁর বেশিরভাগ সম্পদ লুট করা হয়। এর পূর্বে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করে যান।

বনু আব্দিল আসকে দিয়ে তিনি বণ্টন শুরু করেন। আল-হাকাম পরিবারের প্রত্যেক সদস্য ১০ হাজার দিরহাম করে পায়। এভাবে তারা ১ লক্ষ দিরহাম লাভ করে। আত্মীয়-স্বজনদের দান করার পর দেখা

---

১৩ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/৪২।

১৪ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/৫৭।

যায়, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিজের পুত্রের চাইতে তাঁর আত্মীয়রা বেশি সম্পদ পেয়েছে![১৫]

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের সময় তাঁর কিছু সম্পদ থেকে যায়। সেগুলো ছিল:

- ১০০০ টি উট
- খায়বার এবং অন্যান্য জায়গায় প্রায় ২ লক্ষ দিনারের মতো সম্পদ।[১৬]

দুনিয়ার বুকে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এত সম্পদের অধিকারী ছিলেন, যা অকল্পনীয়। কিন্তু, এই বিপুল সম্পদ তাঁকে ইবাদত থেকে বিমুখ করতে পারেনি।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু দিনে রোজা রাখতেন এবং রাতের কিছু অংশ বাদে বাকি সময় নামাজ পড়তেন।[১৭]

তিনি মানুষকে দাওয়াত দিয়ে রাজকীয় খাবার খাওয়াতেন, কিন্তু নিজে কোনোরকম খাবার খেতেন।[১৮]

---

১৫ ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবনে আফফান, পৃষ্ঠা ৩০৫।

১৬ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/৫৭।

১৭ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহুদ: ২/৫৪।

১৮ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহুদ: ২/৫২।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু

"তোমরা ব্যবসা করো। কেননা, রিজিকের দশভাগের নয়ভাগ ব্যবসার মধ্যে রয়েছে।"

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সেই স্বল্পসংখ্যক সাহাবিদের মধ্যে একজন যিনি দুইবার হিজরত করেন। প্রথমবার হিজরত করেন আবিসিনিয়ায়, দ্বিতীয়বার হিজরত করেন মদিনায়।[২৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদের মধ্যে পঁচিশজনের বেশি সাহাবিকে বিভিন্ন সময় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই সৌভাগ্যবান সাহাবিদের একজন, যিনি দুনিয়ার বুকে জান্নাতের সুসংবাদ পান।[২৭]

---

২৬ আল্লামা ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/২৯৫।

২৭ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে থাকাবস্থায় অনেককেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো দশজন। দশজনকে একটি হাদিসে একসাথে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন বলে তাঁদেরকে 'আশারায়ে মুবাশশারা' বলা হয়।

এই দশজন সাহাবি হলেন:

- আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)
- উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

- উসমান ইবনে আফফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)
- আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)
- ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)
- যুবাইর ইবনে আইয়্যাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু)
- আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)
- সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)
- সাঈদ ইবনে যায়িদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)
- আবু উবাইদাহ আমর ইবনুল জাররাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) [জামে' তিরমিজি: ৩৭৪৭]

এই দশজন ছাড়াও আরও যাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতের সুসংবাদ দেন:

- খাদিজাতুল কুবরা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) [সহিহ বুখারি: ৩৮২০]
- আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) [সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহাহ: ১১৪২]
- বিলাল ইবনে রাবাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) [সহিহ বুখারি: ১১৪৯]
- রুমাইসা বিনতে মিলহান (রাদিয়াল্লাহু আনহা) [সহিহ বুখারি: ৩৬৭৯]
- উকাশাহ ইবনে আল-মিহসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) [সহিহ বুখারি: ৫৮১১]
- ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) [সহিহ বুখারি: ৩৬২৪]
- হাসান ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) [জামে' তিরমিজি: ৩৭৬৮]
- হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) [সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহাহ: ৩৭৪]
- আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) [সহিহ বুখারি: ৭০১০]
- জাফর ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) [জামে' তিরমিজি: ৩৭৬৩]
- যায়িদ ইবনে হারিসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) [সহিহ আল-জামিউস সগীর: ৩৩৬১]
- যায়িদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) [সহিহ আল-জামিউস সগীর : ৩৩৬২]
- হারিসা ইবনে আল-নু'মান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) [সহিহ বুখারি: ৬৫৬৭, ৬৫৬৮]
- আবু দাহদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) [সহিহ মুসলিম: ২১২৯]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন:

> *"তোমরা আমার সাহাবিদেরকে গালমন্দ করো না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তবুও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদের সমপরিমাণ সওয়াব হবে না।"*[২৮]

হাদিসটি প্রত্যেক সাহাবির শানে প্রযোজ্য। তবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রেক্ষিতে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কথাটি বলেছিলেন।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ মদিনায় হিজরত করেন প্রায় খালি হাতে। তাঁর হাতে তখন লক্ষ-লক্ষ টাকা ছিল এমন না। মক্কা থেকে যখন হিজরত করেন, তখন তেমন কিছু সাথে করে নিয়ে যেতে পারেননি। তাঁর সকল স্থাবর সম্পত্তি মক্কায় রেখে আসেন।

যারা জীবিকার অন্বেষণে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে, তাদের বাহ্যিক অবস্থা আর আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থার মধ্যে তেমন পার্থক্য করা যাবে না। অনেকে গ্রাম থেকে ঢাকা শহরে আসে উপার্জনের জন্য। কেউ রিকশা চালায়, কেউ তরকারি বিক্রি করে, কেউ চাকরি করে।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যবসার জন্য হিজরত করেননি। তিনি হিজরত করেন দ্বীন পালনের জন্য। ব্যবসা ছিল জীবনের প্রয়োজনে।

মদিনায় গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করে দেন সা'দ ইবনে রাবি'আ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে। সা'দ ইবনে রাবি'আ ছিলেন মদিনার অন্যতম ধনী সাহাবি। তাঁর অনেক জমিজমা ছিল, একাধিক স্ত্রী ছিল।

• ওয়ারাকা ইবনে আন-নওফেল [জামে' তিরমিজি: ২২৮৮]

২৮ সহিহ বুখারি: ৩৬৭৩।

সাহাবিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করা হলে একেকজন সাহাবি তাঁর অপর ভাইকে সবকিছু উজার করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তারা চাইতেন নিজেরা যতটা ভালো আছেন, অপর ভাইকেও ততটা ভালো রাখতে। নিজেরা যতটা সম্পদশালী আছেন, অপর ভাইকেও ততটা সম্পদশালী বানাতে।

অনেকেই তো এমন প্রস্তাব দেন, যেটা ছিল বিস্ময়কর।

সা'দ ইবনে রাবি'আ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন—"ভাই আমার। সবাই জানে যে, আমি আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। তোমার সাথে আমার ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক হয়েছে। তুমি কী চাও আমার কাছে? তুমি আমার কাছে যা চাইবে, আমি তোমাকে তাই দেব।"

সা'দ ইবনে রাবি'আ চাইলেন তাঁর যত সম্পদ আছে, তিনি তাঁর সম্পদকে দুইভাগে ভাগ করবেন। একভাগ রাখবেন নিজের জন্য, আরেক ভাগ দিবেন তাঁর 'দ্বীনি ভাই' আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে।

ঢাকা শহরে গ্রাম থেকে এক লোক এলো। সে আশ্রয় নিলো ঢাকার সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তির কাছে। সেই সম্পদশালী ব্যক্তিটি নিজের গ্রামের লোকের জন্য কী করতে পারেন?

তিনি হয়তো তার জন্য একটি চাকরির ব্যবস্থা করবেন, তার হাতে বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা দিবেন।

কিন্তু, তিনি কি একবার ভাববেন—আমার জীবনে যত সম্পদ উপার্জন করেছি, সেটার ২% অন্তত আমার গ্রামের লোকটাকে দিয়ে দেই?

ঢাকার সবচেয়ে ধনী লোকটি যদি অন্তত ২% সম্পদ দেন, সেটা কোটি টাকার বেশি হবে। এটা তিনি দিবেন না। তিনি চাইবেন না তার মতো কেউ কোটিপতি হোক। একজন ছোট ব্যবসায়ী এসে তার কাছে ব্যবসা করার জন্য ধার চাইলেও তিনি দিবেন না। গ্রামের একটি অসহায় পরিবারকে হয়তো দান করবেন, কিন্তু তারা ব্যবসা করার জন্য ৫-৭ লক্ষ টাকার সাহায্য চাইলে তিনি এড়িয়ে যাবেন।

এরকম ঘটনা আমাদের সমাজে অহরহ দেখা যায়। বিত্তশালীরা দান করে, কিন্তু এমনভাবে দান করে, যেই দানের টাকা দিয়ে গ্রহীতা খাবার কেনা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না।

সা'দ ইবনে রাবি'আ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মানসিকতা এমন ছিল না। তিনি সারাজীবনের কষ্টে উপার্জিত সম্পদ, উত্তরাধিকার সম্পত্তি হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ একজন 'অজানা' মানুষকে দিতে চাচ্ছেন এই কারণে যে, তিনি তাঁর দ্বীনি ভাই। তাঁর দ্বীনি ভাই বিপদে পড়ে হিজরত করেছেন, তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সা'দ ইবনে রাবি'আ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কোটি টাকার সম্পদ একজনকে দিতে চাচ্ছেন।

শুধু সম্পদ দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছেন না।

একজন পুরুষ অন্যের সাথে সবকিছু শেয়ার করতে পারলেও তাঁর স্ত্রীর দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাবে, এটা সহ্য করতে পারে না। সা'দ ইবনে রাবি'আ তাঁর দ্বীনি ভাই আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রস্তাব দিলেন—"আমার দুজন স্ত্রী আছে। এরমধ্যে আপনার যাকে পছন্দ হয়, আমি তালাক দিয়ে দেবো। তাঁর ইদ্দত পূর্ণ হলে আপনি তাঁকে বিয়ে করতে পারবেন।"

এমন সুবর্ণ সুযোগ কয়জন পায়? নতুন শহরে এসে কোনোরকম পরিশ্রম ছাড়া আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু কোটি টাকার সম্পদ পাচ্ছেন, পছন্দমতো একজনকে বিয়ে করতে পারবেন।

একজন যুবকের দুনিয়ার জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার জন্য সম্পদ এবং স্ত্রী ছাড়া আর কী লাগে?

যারা চাকরি করতে চায়, ব্যবসা করতে চায় তাদের একটি উদ্দেশ্য থাকে। সেটা হলো—বিয়ের সিভি ভারী করা। সামাজিকভাবে আমাদের দেশে পাত্র হিসেবে সরকারি চাকরিজীবী, বড় ব্যবসায়ীদের চাহিদা অনেক বেশি। চাহিদা পূরণের জন্য যুবকরা চায় সরকারি চাকরি পেতে, অনেক সম্পদ উপার্জন করতে। এতে করে পাত্র হিসেবে তাকে মূল্যায়ন করা হবে।

কিন্তু, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এত কিছু করতে হয়নি। এসব ছাড়াই তাঁকে মূল্যায়ন করা হয়। একজন যুবক হিসেবে এমন প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবার কল্পনা করাই যায় না।

কিন্তু, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ উদার সাহাবি সা'দ ইবনে রাবি'আর প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন!

তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। কেউ ফ্রিতে কিছু দিলেই নিয়ে নিবেন, এমন মানসিকতা তাঁর ছিল না। প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

বিনয়ের সাথে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে দিয়ে মহানুভব সাহাবির জন্য দু'আ করলেন—

> *"আল্লাহ আপনার পরিবার-পরিজনের মধ্যে বরকত দান করুন। আল্লাহ আপনার সম্পদের মধ্যে বরকত দান করুন।"*

অবাক করা বিষয়! এমন প্রস্তাবও কেউ ফিরিয়ে দেয়?

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দেন, তখন তিনি বিকল্প চিন্তা করছেন।

তিনি মদিনায় নতুন। মদিনার কোথায় বাজার আছে, কোথায় কী বিক্রি হয় সেটা তিনি জানেন না। ঢাকা শহরে একেবারে নতুন যারা আসে, তারাও কিছু চিনে না। অন্যের সাহায্য নেয়।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফও সাহায্য নিতে চাইলেন। সা'দ ইবনে রাবি'আ তাঁকে সম্পদ দেওয়া সত্ত্বেও সম্পদ না নিয়ে বললেন তাঁকে অন্য একটি উপকার করতে। সেটা হলো—মদিনার বাজার কোথায় দেখিয়ে দিতে।

মদিনায় তখন একাধিক বাজার ছিল। কোনো কোনো বাজার ছিল ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে, কোনো কোনো বাজার ছিল সাহাবিদের নিয়ন্ত্রণে।

সা'দ ইবনে রাবি'আ রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনার অলিগলি সব চিনেন। তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখিয়ে দিলেন মদিনার বাজার কোনদিকে, কীভাবে যেতে হয়, ঐ বাজারে কী বিক্রি হয়।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছুটলেন মদিনার বাজারে। মদিনায় নতুন করে শুরু হলো তাঁর ব্যবসায়িক জীবন।[৪]

তখনকার সময় মদিনার বাজারে অনেককিছু বিক্রি হতো। ভোগ্যপণ্য থেকে শুরু করে কাপড়, ঘোড়া সব পাওয়া যেত। ইয়েমেন, শাম, মিসর থেকে কাপড় আসত মদিনার বাজারে।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ প্রথমে বাজার পরিদর্শন করেন। তিনি দেখলেন এই বাজারে কী বিক্রি করা যায়। সবকিছু বিবেচনা করে তিনি ঘি আর পনিরের ব্যবসা শুরু করেন।[৫]

তিনি চাইলে প্রবল ব্যক্তিত্ববোধের কারণে ফ্রিতে না নিয়ে ঋণ নিতে পারতেন সা'দ ইবনে রাবি'আ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে। এতে করে তাঁর ব্যবসা অনেক বড় হতো। মুনাফার্জনের পর ধার পরিশোধ করতে পারতেন।

কিন্তু, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু মাত্র ২ দিনার অথবা ৪ দিনার দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন![৬]

সাহাবিদের যুগে ১ দিনার দিয়ে একটি ভেড়া কেনা যেত। সেই হিসেবে বলা যায়, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু মাত্র ৪টি ভেড়ার টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। আমাদের সময়ে একটি ভেড়ার দাম ১০,০০০ টাকা হলে চারটি ভেড়ার দাম প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যবসায়ের মূলধন ছিল সর্বোচ্চ চল্লিশ হাজার টাকা।

অনেকেই ব্যবসা শুরু করতে চায় টাকা দিয়ে। সে মনে করে, ব্যবসা শুরু করতে চাইলে বুঝি ৪০-৫০ লক্ষ টাকা লাগবে, একটি দোকান ভাড়া নিতে হবে, ডেকোরেশন করতে হবে। দোকানের

---

৪ সহিহ বুখারি: ৩৭৮১।

৫ সহিহ বুখারি: ৩৭৮১।

৬ Islam The Ultimate Peace, 3 Main Business strategies of Abdur Rahman Ibn Awf (RA)
Link: https://islamtheultimatepeace.com/3-main-business-strategies-of-abdur-rahman-ibn-awf-ra/

সিকিউরিটি লাগবে ৫ লক্ষ টাকা, ডেকোরেশনে লাগবে ২ লক্ষ টাকা। এই চিন্তায় অনেকেই ব্যবসা করতে পারে না।

ব্যবসার মূল শর্ত পুঁজি না। পুঁজি হলো ব্যবসার প্রয়োজনীয় উপাদান।

একটি চায়ের দোকান দিতে কত টাকা লাগে? সর্বোচ্চ ত্রিশ হাজার টাকা। যদি আমরা ধরেও নিই, চায়ের দোকান দিতে অনেক টাকা লাগে, তাহলে সেটা কতই বা হবে? ধরে নিলাম ১ লক্ষ টাকা।

ঢাকা শহরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণে মোড়ে চা বিক্রেতারা দিনে ১০-২০ হাজার টাকার চা বিক্রি করেন। যেমন: প্রেসক্লাবের সামনে, বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেট, সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল-সহ গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে চা বিক্রি হয়।

এসব চা বিক্রেতার মাসিক আয় কারো কারো ১ লক্ষ টাকা, কারো কারো আরও বেশি। ভারত, বাংলাদেশের এমন অসংখ্য চা বিক্রেতা রাস্তার মোড়ে চা বিক্রি করে যত টাকা উপার্জন করে, সেটা অনেক সুটেড-বুটেড অফিসারও উপার্জন করতে পারে না।

- ভারতের পুণে শহরের নবন্ত ইউলে নামের এক চা বিক্রেতার মাসিক আয় ১২ লক্ষ টাকা।[৭]

- বাংলাদেশের দিনাজপুরে হিলি গোডাউন মোড়ের চা বিক্রেতা খাদেমুল ইসলাম চা বিক্রি করে মাসে ৯০ হাজার টাকা আয় করেন। দৈনিক তার দোকানে গড়ে ১০০০ কাপ চা বিক্রি হয়।[৮]
- বাংলাদেশের মাদারীপুরের সদর উপজেলার শরিফুল ইসলাম মাসে চা বিক্রি করে ৭০ হাজার টাকা উপার্জন করেন।[৯]

---

৭ আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ মার্চ ২০১৮, চা বিক্রি করে কোটি টাকা কামাচ্ছেন পুণের এক চা বিক্রেতা! লিংক: https://www.anandabazar.com/india/this-pune-tea-seller-earns-crore-by-selling-tea-dgtl-1.765529

৮ রাইজিং বিডি, চায়ের দোকান থেকে আয় ৯০ হাজার টাকা
লিংক: https://www.risingbd.com/amp/news/482730

৯ বাংলা ট্রিবিউন, ৬ জানুয়ারি ২০২৩,ট্রলারচালক থেকে চা বিক্রেতা, মাসে আয় ৭০ হাজার টাকা।

কোনো কাজই তুচ্ছ নয়। প্রত্যেক বড় ব্যবসায়ী একদিনেই কোটিপতি হননি। তারা দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন, আল্লাহ তাদেরকে সফলতা দান করেছেন।

বেশিরভাগ বড় ব্যবসায়ী ব্যবসা শুরু করেন ছোট ব্যবসা দিয়ে। বাংলাদেশের বিখ্যাত ব্যবসায়ী শেখ আকিজ উদ্দিন; আকিজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি যখন ব্যবসা শুরু করেন, তার মূলধন ছিল মাত্র ১৬ টাকা। পাইকারি দামে কমলা কিনে রেলস্টেশনে বিক্রি করতেন। এখন তার প্রতিষ্ঠানের সম্পদের পরিমাণ কয়েকশো কোটি টাকা।[১০]

মুসলিম ইতিহাসে পূর্ববর্তী আলেমগণ জীবিকার্জনের উপায় নিয়ে বই লিখেছেন। সেখানে তারা আলাদা অধ্যায় লিখেছেন তুচ্ছ কাজ করে জীবিকার্জন নিয়ে।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর প্রধান ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি জীবিকার্জন নিয়ে বই লিখেন 'কিতাবুল কাসব'।[১১]

বইয়ের একটি অনুচ্ছেদের নাম দেন—'তুচ্ছ কাজের মাধ্যমেও জীবিকার্জন বৈধ'। তিনি লিখেন—"বৈধ হবার দিক থেকে সকল জীবিকা একই পর্যায়ের।"[১২]

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দেন। তিনি বলেন:

> *"তুমি মানুষের কাছে হাত পাতবে, আর তারা তোমাকে কিছু দেবে অথবা দেবে না—এরচেয়ে তোমার জন্য উত্তম হলো*

---

১০ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৮ ডিসেম্বর ২০১৮, মাত্র ১৬ টাকা থেকে হাজার কোটির মালিক

লিংক:https://web.archive.org/web/20181208015825/http://www.bd-pratidin.com/various/2017/10/01/268473

১১ বাংলা ভাষায় বইটি 'জীবিকার খোঁজে' নামে অনূদিত। মাকতাবাতুল বায়ান থেকে প্রকাশিত।

১২ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী, জীবিকার খোঁজে, পৃষ্ঠা ৭১।

> *কাজ করে জীবিকা উপার্জন করা; এই উপার্জন ক্রিয়ায় মর্যাদার কিছুটা ঘাটতি থাকলেও।"*[১৩]

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনার বাজারে গিয়ে উপার্জন করে স্বল্প সময়ের মধ্যেই অনেক মুনাফার্জন করেন।

ব্যবসায়ে লাভ করার পর আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিয়ে করেন। মক্কায় থাকাবস্থায় জাহেলি যুগেও তিনি বিয়ে করেছিলেন।

একদিন তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দিয়ে যাবার সময় নবিজি লক্ষ করলেন তাঁর কাপড়ে হলুদ দাগ। আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে জিজ্ঞেস করলেন, কাপড়ে হলুদ দাগ কেন?

আব্দুর রহমান জানালেন, তিনি বিয়ে করেছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য দু'আ করলেন। তাঁকে বললেন,

> *"একটি বকরি দিয়ে হলেও ওয়ালিমা করো।"*[১৪]

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর 'নিজের পায়ে দাঁড়াতে' কতদিন সময় লাগে? ২ মাস? ৬ মাস?

মদিনায় যাবার পরপরই তিনি সম্পদের মালিক হতে পারতেন, সা'দ ইবনে রাবি'আ রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণের পর তাঁকে বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু, তিনি তা করেননি। বরং নিজের প্রচেষ্টায় ব্যবসা দাঁড় করান, সেখান থেকে মুনাফার্জন করেন, অতঃপর বিয়ে করেন।

বর্তমান সময়ের অনেক তরুণ বিয়ের জন্য আগ্রহী। তারা হারাম থেকে বাঁচার জন্য বিয়ে করতে চায়। এজন্য বাবাকে বিয়ের জন্য অনুরোধ জানায়, বাবা যেন তাদেরকে বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন।

শুধুমাত্র বাবার ওপর নির্ভর করে বিয়ে করতে যাওয়া অনেকটা অসম্ভব। এমন সামর্থ্যবান বাবা অনেক কম আছেন, এমন

---

১৩ শায়খ আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী আল হিন্দি, কানযুল উম্মাল: ৪/১২২।

১৪ সহিহ বুখারি: ৩৭৮১।

মনমানসিকতাও কম। তাছাড়া পাত্রীপক্ষ একেবারে বেকার কারো হাতে মেয়ে তুলে দিতে রাজি না।

একজন ছেলে যদি বিয়ের আগে, বিয়ের পর শুধু বাবার কাছে টাকা চায়, তাহলে অল্পদিনের মধ্যে সে নিজের স্ত্রীর কাছে 'ব্যক্তিত্বহীন' হয়ে উঠবে। স্ত্রীর প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্যও যদি বাবার কাছে হাত পাততে হয়, এটা কয়েকদিন পর স্ত্রী মেনে নিবে না। এই নিয়ে ঝগড়া শুরু হবে। সাংসারিক জটিলতা দেখা দিবে।

এজন্য পুরুষের বিয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম 'সামর্থ্য' থাকাকে শর্ত করেছে। এই সামর্থ্য হলো—শারীরিক, আর্থিক সামর্থ্য।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

> *"যার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোজা রাখে। কেননা রোজা তার জন্য জৈবিক উত্তেজনা প্রশমনকারী।"*[১৫]

তরুণদের মধ্যে যাদের বিয়ের আগ্রহ আছে, তারা যদি বিয়ে করার জন্য ন্যূনতম সম্পদ জমায়, তাহলে তার জন্য বিয়ে করা সহজ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন— মোহরানা, বিয়ের অনুষ্ঠানের ন্যূনতম ব্যয়, স্ত্রীকে নিয়ে অন্তত এক মাস চলার উপযোগী অর্থ।

একজন ছেলে যদি বিয়ে করার জন্য সম্পূর্ণভাবে বাবার ওপর নির্ভরশীল হয়, সে যদি মোহরানা থেকে শুরু করে স্ত্রীর হাত খরচের টাকাও বাবার কাছ থেকে নিতে চায়, তাহলে বেশিরভাগ বাবা ছেলেকে বিয়ে দিতে চাইবে না।

ছাত্রাবস্থায় টিউশনি করে, ছোটখাটো ব্যবসা করে কেউ যদি উপার্জনের রাস্তা তৈরি করে, তার জন্য বিয়ে করা সহজ হয়ে যায়। সমাজ তার জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেও সে জোর গলায় বলতে পারে—'আমার তো সামর্থ্য আছে'।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্যের স্ত্রীকে বিবাহ ও তার সম্পদ লাভের প্রস্তাব পাওয়া সত্ত্বেও এর কোনোটিই গ্রহণ

---

১৫ সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৮৪৬।

করেননি। এমন না যে তিনি সম্পদ জমাবেন না বা বিয়ে করবেন না। বরং তার চিন্তা ছিল অন্যের সম্পদ ভোগ করবেন না, যদিও সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তাঁকে দিচ্ছে।

এই মানসিকতার কারণে তিনি বড় ব্যবসায়ী হতে পেরেছিলেন। তিনি গ্রহীতা হয়ে জীবন কাটাতে চাননি, তিনি চেয়েছেন দাতা হয়ে জীবন কাটাতে। তাঁর বাকি জীবনে এই বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। উপার্জন করতেন আর দান করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

> *"ওপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।"*[১৬]

ওপরের হাত হলো দাতার হাত, আর নিচের হাত হলো গ্রহীতার হাত। ভিক্ষা করা একটি নিন্দনীয় কাজ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময় তাঁর সাহাবিদেরকে উৎসাহ দেন কাজ করে উপার্জন করতে।

একবার তিনি সাহাবিদেরকে বলেন:

> *"তোমাদের কারো জন্য রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করতে বের হওয়া মানুষের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে উত্তম।"*[১৭]

ঘি এবং পনিরের ব্যবসা করার পর আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোড়ার জিনের ব্যবসা করেন।

এই ব্যবসা ছিল বেশ লাভজনক। এটা অনেকটা গাড়ি বিক্রি না করে গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ বিক্রি করার মতো।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু এই ব্যবসায় সফল হবার পর ঘোড়া কেনাবেচার ব্যবসা শুরু করেন।

- তাঁর ব্যবসার অন্যতম সফলতা ছিল তিনি দ্রুত বিক্রি করতেন। অধিক লাভের আশায় পণ্য মজুদ করতেন না। ২০০০ টাকায় কেনা পণ্য ভেবেছিলেন ২৫০০ টাকা বিক্রি করবেন। কিন্তু,

---

১৬ সহিহ বুখারি: ১৪৭২।

১৭ সহিহ বুখারি: ২০৭৫।

কেউ যদি এসে বলে '২১০০ টাকায় দিয়ে দাও', তাহলে তিনি বিক্রি করে দিতেন।

- তাঁর ব্যবসায় Cash inflow ছিল অনেক দ্রুত। একটি পণ্য একমাস পর বিক্রি করলে লাভ হয়তো ২০% বাড়ত। কিন্তু, এখন বিক্রি করলে ৫% লাভ পাওয়া যাবে। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু একমাসের অপেক্ষা করতেন না।[১৮]

অনেকেই মনে করেন, দান করলে টাকা কমে যায়। কারো পকেটে ১,০০০ টাকা আছে। সেখান থেকে ১০০ টাকা দান করলে দৃশ্যমান হিসেব বলে, পকেটে আর ৯০০ টাকা আছে। কিন্তু, ইসলাম কেবলমাত্র দৃশ্যমান অর্থের হিসাব করে না।

কেউ যখন আল্লাহর রাস্তায় দান করে, আল্লাহ তাকে আরও সম্পদ দান করেন। ১০০ টাকা দান করার পর তার পকেটে হয়তো ৯০০ টাকা আছে। হালাল উপায়ে অর্জিত অর্থ দান করার মাধ্যমে ব্যক্তি তার সম্পদকে পবিত্র করে, আল্লাহ তার সম্পদে বরকত দান করেন। এই বরকত কীভাবে আসে সে বুঝতেই পারে না।

সারাদিনে সে বিক্রি করেছে ১০,০০০ টাকা। লাভ হয়েছে ১,০০০ টাকা। দান করার ফলে দেখা যাবে কোনো একটি পণ্যে তার ব্যয় কমে গেছে বা পরদিন সে অপ্রত্যাশিত মুনাফার্জন করেছে।

যে ব্যক্তি দান করে, আল্লাহ তার হাতে সম্পদ দেন। তাকে দান করার সুযোগ দেন।

আবার অনেকেই মনে করেন, 'সম্পদ হলে দান করব'। এই ধারণাও ঠিক না। আপনার যা আছে, তা থেকেই আপনি দান করতে পারেন। এর মাধ্যমে আপনার যে 'এখন আছে' এটার কৃতজ্ঞতা আদায় করছেন। যত বেশি উপার্জন করতে পারবেন, তত বেশি দান করতে পারবেন। তার মানে এই না যে, কম উপার্জন করছেন বলে দান করবেন না।

---

১৮ Islam The Ultimate Peace, 3 Main Business strategies of Abdur Rahman Ibn Awf (RA) Link: https://islamtheultimatepeace.com/3-main-business-strategies-of-abdur-rahman-ibn-awf-ra/

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

> *"দান করলে সম্পদ কমে না।"*[১৯]

সাহাবিদের হাতে যখন সম্পদ খুব একটা ছিল না, তখনও তারা দান করতেন। শুধু নিজেরাই দান করতেন না, পরিবারের সদস্যদেরকেও দান করতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ে ছিলেন আসমা বিনতে আবি বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের সময় আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে সহযোগিতা করেন, খাবারের ব্যবস্থা করেন। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন প্রখ্যাত সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু; যিনি ছিলেন সাহাবিদের মধ্যে সর্বশেষ খলিফা।

আসমা বিনতে আবি বকরকে বিয়ে করেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু। তাঁদের ঘরে তিনজন কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তারা হলেন—খাদিজা বিনতে যুবাইর, আয়িশা বিনতে যুবাইর, উম্মুল হাসসান বিনতে যুবাইর।

একদিন আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর মেয়েদেরকে বললেন:

> *"ব্যয় করো এবং দান করো। 'অনেক সম্পদ হলে দান করব' —এমনটা ভেবো না। তাহলে দেখবে, সম্পদও হবে না, দান করাও হবে না। অনেক সম্পদ না থাকা সত্ত্বেও যদি দান করো, তাহলে তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না।"*[২০]

সাহাবিদের দৃষ্টিভঙ্গি আর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এই জায়গায়। আমরা দান করার জন্য সম্পদশালী হওয়াকে শর্ত বানিয়েছি। কিন্তু, সাহাবিরা দান করার জন্য সম্পদশালী হবেন এমনটা ভাবতেন না। তাঁদের যা ছিল, তাই দিয়েই দান করতেন।

- আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু দুহাত ভরে দান করতেন। তিনি দান করার সময় কার্পণ্য করতেন না।

---

১৯ সহিহ মুসলিম: ৬৪৮৬।

২০ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৮/১৭৮।

রাসূলুল্লাহর দু'আ, তাঁর সততা, আমানতদারিতা এবং অনেক দান করার ফলে তিনি ব্যবসায় বরকত অনুভব করেন। তিনি বুঝতে পারেন, যেখানেই হাত দেন, সেটা স্বর্ণে পরিণত হয়।

গ্রিক মিথলজিতে 'মাইডাস' নামে একটি চরিত্র আছে। মাইডাসের ইচ্ছে ছিল, সে যেটাতে হাত দিবে, সেটা যেন স্বর্ণে পরিণত হয়। সে আপেলে হাত দিলে সেটা স্বর্ণে পরিণত হতো, টেবিলে হাত দিলে সেটা স্বর্ণে পরিণত হয়। তার এমন আকাঙ্ক্ষা একসময় তার দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একদিন সে তার মেয়ের হাত ধরলে মেয়ে স্বর্ণে পরিণত হয়। অতঃপর সে চায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে।

তার এই গল্পটির ফলে একটি প্রবাদ তৈরি হয়। যার নাম *'Midas Touch'*.

মাইডাসের গল্পটি কল্পকাহিনি, মিথলজি। কিন্তু, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রায় অনুরূপ কথা বলেন।

তিনি বলেন:

> *"আমি সম্পদে এমন বরকত লাভ শুরু করলাম, আমার মনে হতো—আমি যদি একটি পাথর তুলি, পাথরের নিচে দেখব স্বর্ণ বা রুপা পড়ে আছে!"*[২১]

একবার মদিনায় শোরগোল পড়ে গেল। চারিদিকে ধুলো উড়ছে। সবাই আতঙ্কিত। মদিনায় বিশাল সৈন্যবাহিনী আসলে এমনটা হবার কথা। একজন খোঁজ নিতে গেল। গিয়ে শুনল এটা আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যবসায়িক কাফেলা। ৭০০ উট বোঝাই পণ্য মদিনায় এসেছে। একেকটি উটে অনেক টাকার পণ্য। মদিনার বাজারে এগুলো পাইকারি বিক্রি হবে।

একটি উটে কেমন পণ্য বহন করা সম্ভব এটা বুঝার জন্য আমরা চিন্তা করতে পারি একটি ভ্যান বা ঠেলাগাড়ির সাথে। একটি ভ্যানে অন্তত পক্ষে ১০,০০০ টাকার খাদ্যদ্রব্য রাখা যাবে।

---

২১ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/৯৬।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুরো কাফেলায় সেই হিসেবে প্রায় ৭০০ ভ্যান খাদ্য ছিল। প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার পণ্য।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু সব পণ্য বিক্রি না করে দান করে দেন। এমনকি পণ্য বহনাকারী উট, উটের রশি পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় দান করেন।[২২]

বাংলাদেশে একটি উটের দাম গড়ে ১০ লক্ষ টাকা।[২৩]

৭০০ উটের দাম দাঁড়ায় ৭০ কোটি টাকা!

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু এটা ভাবতেন না যে, দান করলে মূলধন পুনরায় বিনিয়োগ করব কীভাবে। তিনি জানতেন দান করলে সম্পদ কমে না, বরং বাড়ে। এত কোটি টাকার মালিক হওয়া সত্ত্বেও টাকাগুলো তার হাতে থাকত না। কারণ, তিনি সম্পদ অন্তরে স্থান দেননি। যারা অন্তরে সম্পদ স্থান দেয়, তারা দান করতে পারে না। সম্পদের মোহে পড়ে যায়।

একবার আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একটি জমি বিক্রি করেন ৪০,০০০ দিনার দিয়ে। ৪০,০০০ দিনার দিয়ে সাহাবিদের সময় চল্লিশ হাজার ভেড়া কেনা যেত। দুই ধনী সাহাবির মধ্যে লেনদেন। এক ধনী সাহাবি জমি বিক্রি করেন আরেক ধনী সাহাবির নিকট।

একটি ভেড়ার দাম বর্তমানে ১০,০০০ টাকা হলে ৪০ হাজার ভেড়ার দাম হবে ৪০ কোটি টাকা!

জমি বিক্রির টাকা তিনি তিনভাগে ভাগ করেন।

- একভাগ দেন তার নিকটাত্মীয় বনু নাজিরকে
- একভাগ দেন মদিনার দরিদ্র লোকদেরকে
- আরেকভাগ দেন উম্মুল মুমিনিনদেরকে।[২৪]

---

২২ আল্লামা ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াঃ ৭/২৯৬।

২৩ হাম্বা-হাম্বা.কম, Camel History – Characteristics & Price in Bangladesh Link: https://hamba-hamba.com/camel-history-characteristics-price-in-bangladesh/

২৪ তাবাকাতে ইবনে সা'দঃ ৩/১০১।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে যখন তাঁর ভাগ নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য দু'আ করেন—"আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতের সালসাবিল ঝরনার পানি পান করান।"[২৫]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর আব্দুর রহমান ইবনে আউফ বিভিন্ন সময় নবিজির পরিবারে উপহার পাঠাতেন। উম্মুল মুমিনিনদের হজ থেকে শুরু করে যাবতীয় ব্যয় বহনের সুযোগ পেলে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু সবার আগে এগিয়ে যেতেন।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর সম্পদের পরিমাণ ছিল:

- ১০০টি উট
- ৩০০০টি ভেড়া
- ১০০টি ঘোড়া
- জমিতে পানি দেবার জন্য ২০টি উট
- ১৯ লক্ষ ২০ হাজার দিরহাম রেখে যান; যা দিয়ে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ভেড়া কেনা যেত। ১০,০০০ টাকা ভেড়ার মূল্য ধরলে তাঁর রেখে মূল্য দাঁড়ায় ১৬০ কোটি টাকা![২৬]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সকল সাহাবির উট, ঘোড়া ছিল না। বদর যুদ্ধে দেখা যায় মুষ্টিমেয় কয়েকটি উট, ঘোড়া ছিল। সাহাবিদের যুগে একজনের ব্যক্তিগত ঘোড়া থাকা আমাদের সময়ে প্রাইভেট কার থাকার মতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাক্কি জীবনে কোনো উট ছিল না। হিজরত করার জন্য তিনি একটি উট কিনেন।

সেই জায়গায় আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর উট ছিল ১০০টি। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমস্ত সম্পদ হিসেব করলে সেটা কয়েকশো কোটি টাকা হয়।

---

২৫ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/১০১।

২৬ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/১০২।

যে সাহাবি মদিনায় প্রায় খালি হাতে যান, যাকে ফ্রিতে সম্পদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল, তিনি গ্রহণ করেননি, সেই সাহাবি ইন্তেকালের সময় রেখে যান কয়েকশো কোটি টাকা।

তিনি এই সম্পদ অর্জন করেন মাত্র ৩০ বছরে।

এমন না যে ঐ ত্রিশ বছর সম্পদ অর্জন করতে গিয়ে তিনি দ্বীন-দুনিয়া ভুলে যান, সম্পদের মোহে সম্পদের পেছনে ছুটতে থাকেন। তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বদর সহ অন্যান্য প্রায় সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এমনকি নবিজির সাথে ছাড়াও তাঁকে বিশেষ অভিযানে প্রেরণ করা হয়। সেটা ছিল দুমাতুল জান্দাল অভিযান। এই অভিযানে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সেনাপতি।[২৭]

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলা হয়, তাঁকে তিন জায়গার যেকোনো এক জায়গায় পাওয়া যাবে।

- হয় তাঁকে মসজিদে পাওয়া যাবে; যেখানে তিনি ইবাদত করছেন
- হয় তাঁকে জিহাদের ময়দানে পাওয়া যাবে; যেখানে তিনি শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন
- নতুবা তাঁকে বাজারে পাওয়া যাবে; যেখানে তিনি ব্যবসা করতেন।

তাঁকে এই তিন জায়গার যেকোনো এক জায়গায় পাওয়া যেত। তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটত এই তিন জায়গায়।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ সারাজীবন সম্পদ দান করে যান। এমনকি ইন্তেকালের আগেও তিনি তাঁর সম্পদ দান করেন।

ইন্তেকালের আগে তিনি অসিয়ত করে যান, তাঁর সম্পদ থেকে যেন ৫০,০০০ দিনার আল্লাহর রাস্তায় দান করা হয়।[২৮]

সেই সময়ের অর্থমূল্যে যা অন্তত ৫০ কোটি টাকা!

---

২৭ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/৯৯, আল্লামা ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/২৯৫।

২৮ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/১০৪।

তিনি অসিয়ত করে গেলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সাহাবি যেন ৪০০ দিনার করে পান। সেই সময় বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের মধ্যে জীবিত ছিলেন প্রায় ১০০ জন সাহাবি।[২৯]

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবশিষ্ট সম্পত্তি থেকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একেকজন সাহাবি পান প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা।

অনেকেই মনে করেন সাহাবিরা খেতে পারতেন না, তারা গরিব ছিলেন। কথাটি আংশিক সত্য। ইসলামের প্রথম দিকে, অন্তত খায়বার বিজয়ের পূর্বে বেশিরভাগ সাহাবির এমন অবস্থা ছিল।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

> *"খায়বার বিজয়ের পূর্বে আমরা পেট ভরে আহার করতে পারতাম না!"*[৩০]

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হবার পর অনেক দেশে মুসলিমরা জয়লাভ করে। পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে যুদ্ধলব্ধ গনিমত, যাকাতের অর্থ, জিজিয়া (অমুসলিমদের দেওয়া ট্যাক্স) জড়ো হতে থাকে বায়তুলমালে।

খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কল্যাণমুখী অর্থনৈতিক প্রকল্প হাতে নেন। সমাজের মানুষজন বায়তুলমাল থেকে উপকৃত হতো। তিনি বার্ষিক ভাতার ব্যবস্থা করেন সবার জন্য। সমাজে বসবাসকারী বেশিরভাগ মানুষ ভাতা পেত।

ভাতার স্কেল ছিল নিম্নরূপ:

- উম্মুল মুমিনিনদের ভাতা ছিল ১০,০০০ দিরহাম
- মুহাজির সাহাবিদেরকে দেওয়া হতো ৪,০০০ দিরহাম
- মুহাজির ও বদরি সাহাবিদেরকে দেওয়া হতো ৫,০০০ দিরহাম

---

২৯ আল্লামা ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/২৯৬-৯৭।

৩০ সহিহ বুখারি: ৪২৪৩।

- হুদাইবিয়ার সন্ধিতে যারা ছিলেন, তাদেরকে দেওয়া হতো ৩,০০০ দিরহাম
- নবজাতকের জন্য ছিল ১০০ দিরহাম।[৩১]

সেই সময় ১২ দিরহাম দিয়ে একটি ভেড়া কেনা যেত। উম্মুল মুমিনিনগণ চাইলে ৮৩৩টি ভেড়া কিনতে পারতেন; যা প্রায় ৮৩ লক্ষ টাকার সমান। অন্যান্য সাহাবিরাও অন্তত ৩০-৪০ লক্ষ টাকা বার্ষিক ভাতা পেতেন।

সন্তান জন্মগ্রহণ করলে খরচাপাতি আছে। হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করলে হাসপাতালের বিল দিতে হয়, ওষুধপত্র কিনতে হয়, ৬ মাস হলে বাজার থেকে দুধ, সেরেলাক, ডায়পার কিনতে হয়। নবজাতকের জন্য আলাদাভাবে খরচ করাটা সব যুগেই ছিল।

মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো সন্তান জন্মের আনন্দে যেমন খুশি হয়, তেমনি খরচের কথা মনে পড়লে কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ে। বাবাকে তখন 'ওভারটাইম' কাজ করতে হয়। যারা আগে থেকে টাকা জমিয়েছে, তারা তখন টাকা তুলে খরচ করে।

ইসলামের স্বর্ণযুগে সন্তানের মা-বাবাকে এমন চিন্তা করতে হতো না। তখন প্রত্যেক নবজাতকের জন্য অর্থ বরাদ্দ ছিল। শুধু 'অর্থ মন্ত্রণালয়ে' (বায়তুলমাল) জানাতে হতো। বাড়িতে 'ভাতা' পাঠানো হতো।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় একেকজন নবজাতকের জন্য ১০০ দিরহাম বরাদ্দ ছিল।[৩২]

নবজাতকের বাবা সাহাবি-তাবেয়িগণ চাইলে এই ১০০ দিরহাম দিয়ে ৮টি ভেড়া কিনতে পারতেন। সেই অনুসারেও যদি বর্তমানে এই প্রথাটা চালু হতো, তাহলে প্রত্যেক নবজাতক দুনিয়াতে আসার সাথে সাথে অন্তত ৮০,০০০ টাকা পেত!

---

৩১ ড. আলী সাল্লাবি, উমর ইবনুল খাত্তাব: ১/৪৭৭-৪৮০।

৩২ ড. আলী সাল্লাবি, উমর ইবনুল খাত্তাব: ১/৪৮৭।

খিলাফত, ইসলামি রাষ্ট্র মানেই শুধু চোরের হাত কাটা নয়। ইসলামের স্বর্ণালি যুগে রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখী দিকগুলো এত বিস্তৃত ছিল, এত চমৎকার ছিল, বর্তমান সময়ে তথাকথিত অনেক রাষ্ট্রে এমন সুবিধা নেই।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেকগুলো স্বর্ণের টুকরো রেখে যান। তাঁর ইন্তেকালের পর সেসব স্বর্ণ কাটতে গিয়ে মানুষের হাতে ফোসকা পড়ে যায়![৩৩]

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু এত সম্পদশালী ছিলেন এবং এত সম্পদ দান করা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে আল্লাহভীতি ছিল। তিনি দান করছেন এই ভেবে এতটা আত্মবিশ্বাসী হতেন না যে—'আমার আর কী করার আছে? আমি সব করেছি, আমি তো জান্নাতে যাব'। এসব মনে করে তিনি প্রফুল্লবোধ করতেন না। বরং স্মরণ করতেন সেসব সাহাবির কথা, যারা দুনিয়ার জীবন অনেক কষ্টে কাটান। তিনি আশঙ্কা করেন, না জানি তিনি দুনিয়াতেই সব পেয়ে যাচ্ছেন।

একদিন রোজা রাখার পর ইফতারে তাঁকে ভালো খাবার পরিবেশন করা হয়। খাবার দেখে তিনি কান্না করে দেন। তিনি বলেন:

"মুসআব ইবনু উমাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। কিন্তু তাঁকে শুধু একটি চাদর দিয়ে দাফন করা হয়েছিল। এটা এমনই খাটো ছিল যে, যদি মাথা ঢাকা হতো পা খুলে যেত আর পা ঢাকা হলে মাথা খুলে যেত। (সর্বশেষে [চাদর দিয়ে] তার মাথা ঢেকে পাগুলোর ওপর 'ইযখির' [ঘাস] দেওয়া হয়েছিল)। (হাদিসের রাবি) ইব্রাহিম বলেন, আমার মনে হয় আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এ কথাও বলেছেন, (উহুদের) আরেক শহীদ হামযাহ্ও আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। (মুসআব-এর মতো) তাঁরও এক চাদরে দাফন নসিব হয়েছিল। (এখন মুসলিমদের দরিদ্রতা আল্লাহর ফজলে দূর হয়েছে)

---

৩৩ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/১০৪, আল্লামা ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/২৯৭।

আমাদের জন্য এখন দুনিয়া বেশ প্রশস্ত হয়েছে, যা দৃশ্যমান। অথবা তিনি বলেছেন, "দুনিয়া এখন আমাদেরকে এতই পর্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়া হয়েছে যে, আমার ভয় হয় আমাদের নেক কাজের বিনিময় ফল আমরা মৃত্যুর আগে দুনিয়াতেই পেয়ে যাই কি না।" অতঃপর আব্দুর রহমান ইবনে আউফ কাঁদতে লাগলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত সামনের খাবারই ছেড়ে দিলেন।[৩৪]

এত এত টাকার মালিক হওয়া সত্ত্বেও আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। যখনই সুযোগ পেতেন মানুষের উপকারের চেষ্টা করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

> *"সর্বোত্তম মানুষ সেই, যে মানুষের জন্য অধিক উপকারী।"*[৩৫]

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সম্পদের মাধ্যমে মানুষের উপকারের চেষ্টা করতেন। যার কারণে, মদিনার প্রায় প্রত্যেকেই তাঁর মাধ্যমে আর্থিকভাবে উপকৃত হয়।

তাঁর ব্যাপারে বলা হতো—"মদিনার মানুষজনকে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ তিনভাবে সাহায্য করেন।"

- যাদের ঋণ প্রয়োজন, তাদেরকে ঋণ দিয়ে। পরবর্তী সেসব ঋণ মাফ করে দেন।
- যারা ঋণগ্রস্ত তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করেন।
- যারা অভাবী, তাদের আর্থিক সহযোগিতা করেন।

একজন ভালো মানুষের কাছে টাকা থাকা উত্তম। এর মাধ্যমে সে অন্যদের উপকার করতে পারে। দান করতে পারে, অভাবগ্রস্তকে সহযোগিতা করতে পারে, ঋণগ্রস্তকে টাকা দিয়ে তার দুশ্চিন্তা দূর করতে পারে।

---

৩৪ সহিহ বুখারি: ১২৭৫।

৩৫ আল-মুজামুল আওসাত: ৫৯৩৭।

একবার নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম তাঁর সাহাবি আব্দুর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, "আমি তোমাকে সম্পদ উপার্জনের জন্য উৎসাহ দিচ্ছি। সৎ মানুষের হাতে হালাল সম্পদ থাকা অতি উত্তম। তা নিয়ে সে আল্লাহভীরুতার সম্পর্ক বজায় রাখে।"[৩৮]

বর্তমান সময়ে যারা সম্পদশালী, কোটিপতি, তারা হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না। আর যারা হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে, আল্লাহর বিধান মেনে চলতে চায়, তাদের হাতে সম্পদ নেই। বারবার, অনেক ভালো ভালো উদ্যোগ থেমে যায় টাকার অভাবে। পর্যাপ্ত অর্থসংস্থানের অভাবে শিশু-কিশোর, তরুণদের নিয়ে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়, তাদেরকে দ্বীনের ওপর অবিচল রাখার জন্য যেমন উৎসাহ দেবার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়, সেগুলো ব্যর্থ হয়। কয়েক মাস চলার পর আর চলতে পারে না। এসব জায়গায় দান করার মানসিকতা যাদের থাকে, তাদের হাতে অর্থ থাকে না। যাদের অর্থ আছে, তাদের মানসিকতা নেই।

একজন সৎ ব্যক্তির হাতে অর্থ থাকা মানে এর দ্বারা সে সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে। মুসলিম ইতিহাসে যত বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, সেটার পেছনে সৎ মানুষের উদ্যোগ, সৎ মানুষের অর্থসংস্থান ছিল।

নিজামুল মুলক তৎকালীন সময়ের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনেন। এটা সম্ভব হয়েছিল রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা এবং অর্থসংস্থানের কারণে।

এখনকার সময়ে মুসলিমরা ধনী হলে, কোটিপতি হলে সেটার মাধ্যমে শুধু তার ব্যক্তিগত লাভ হবে এমন না। পুরো সমাজ উপকৃত হবে। তবে, অবশ্যই তাকে সাহাবিদের মতো মনমানসিকতা লালন করতে হবে। শায়খ তাওফিক চৌধুরী যেটাকে বলেন—

> "সম্পদ থাকবে হাতে, হৃদয়ে থাকবেন আল্লাহ।"

---

৩৮ মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২; ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহর শর্তে সহিহ।

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু

"বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন
শহীদদের সাথে থাকবে।"

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের মধ্যে যারা জান্নাতের সুসংবাদ পান, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি ছিলেন সৌভাগ্যবান সেই ১০ জন সাহাবির একজন, যাদেরকে বলা হয় 'আশারায়ে মুবাশশারা'।[১]

বসরার বাজারে ব্যবসা করতে যান তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ। সেখানকার একজন পাদ্রী তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে জানালে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেন।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবি হবার আগ থেকেই তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ব্যবসায়ী। রাসূলুল্লাহর সাথে প্রায় সবগুলো যুদ্ধে তিনি অংশ নেন। উহুদ যুদ্ধে মারাত্মক আহত হন। ফলে, রাসূলুল্লাহ তাঁর উপাধী দেন 'জীবন্ত শহীদ'।

তিনি ছিলেন অনেক সম্পদের মালিক। যারা অনেক সম্পত্তির মালিক, তাদের সাধারণত দুশ্চিন্তা হয়, ঘুম আসে না। তারা ভয়ে থাকে

---

১ জামে' তিরমিজি: ৩৭৪৭।
২ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/১৬৪।

কখন তাদের সম্পদ হারিয়ে যায়! কীভাবে সম্পদ বাড়ানো যায় এই নিয়ে তারা বেশিরভাগ সময় চিন্তামগ্ন থাকে।

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুও চিন্তায় থাকতেন। তিনিও তাঁর সম্পদ নিয়ে দুশ্চিন্তা করতেন। তবে, তাঁর চিন্তা আর বর্তমান সময়ের সম্পদশালী ব্যক্তিদের চিন্তার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

একদিন তাঁকে চিন্তিত দেখে একজন জিজ্ঞেস করল, "কী হলো? আপনাকে এমন মনমরা দেখা যাচ্ছে কেন? পারিবারিক সমস্যা?"

তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "না, পারিবারিক সমস্যা না। আমার চিন্তা হচ্ছে সম্পদ নিয়ে।"

তাঁর দাদি বললেন,

> *"তাহলে সম্পদ দান করে দাও। এই সম্পদই যেহেতু তোমার চিন্তার কারণ, এটা দান করে দিলেই তো তুমি চিন্তামুক্ত হয়ে যাবে।"*

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ দাদির কথা আমলে নিলেন। তিনি তাঁর দাসীকে ডেকে বললেন তাঁর সম্পদ জড়ো করতে এবং গরিবদের খবর দিতে। তাঁর কথামতো সম্পদ জড়ো করা হলো।

তাঁর সম্পদ হিসেব করে দেখা গেল ৪ লক্ষ দিরহাম। যা বর্তমানে প্রায় ৩৩ কোটি টাকার সমপরিমাণ!

তখন পর্যন্ত সেই সম্পদ ছিল তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের সমস্ত উপার্জন। সেগুলো জমা করে তিনি দান করে দেন![৩]

আল্লাহর রাস্তায় যিনি সম্পদ দান করেন, আল্লাহ তাঁকে আরও সম্পদ দান করেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দান করলে সম্পদ কমে না (বরং বাড়ে)।

---

৩ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/১৬৮।

সাহাবিদের জীবনী পড়লে দেখা যায় এই কথাটি শতভাগ সত্য। তারা আল্লাহর রাস্তায় এত এত সম্পদ দান করা সত্ত্বেও তাঁদের সম্পদ কমেনি।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মোট ৩ বার তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করেন।

- প্রথমবার হিজরতের সময়
- দ্বিতীয়বার তাবুক যুদ্ধের সময়
- তৃতীয়বার ইন্তেকালের পূর্বে

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জীবদ্দশায় দুইবার সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করার পরও আল্লাহ তাঁকে সম্পদ দান করেন। তিনি সম্পদের মোহে আসক্ত ছিলেন না বলে সম্পদ তাঁকে প্রতারিত করতে পারেননি। সম্পদ তাঁর হাতে ছিল বলে সম্পদ দান করতে পারেন। যাদের সম্পদ হৃদয়ে জায়গা করে নেয়, তারা তখন সম্পদ দান করতে পারে না।

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করার পর পরেরবার আল্লাহ তাঁকে কয়েকগুণ বেশি সম্পদ দান করেন। এই সম্পদ লাভ করেন মূলত ইরাকে কৃষিক্ষেত ও ব্যবসা থেকে। তাঁর অর্থোপার্জনের উৎস ছিল ইরাককেন্দ্রিক।

একবার তিনি তাঁর একটি জমি বিক্রি করেন উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে। জমির দাম ছিল ৭ লক্ষ দিরহাম।

তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে দিনের বেলা ৭ লক্ষ দিরহাম আসে।

তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু এত টাকা দেখে টাকার লোভে পড়েননি। তিনি ঐদিন মনে মনে বলেন,

> *"একজন মানুষ এত টাকা ঘরে রেখে সে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না।"*

তাই বলে এমন না যে এগুলো তিনি ঘরে না রেখে ব্যাংকে রাখবেন, নিরাপদ জায়গায় রাখবেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন সমস্ত টাকা মানুষকে দান করে দিবেন।

তাঁর খাদেমকে জানিয়ে দেন—রাতের মধ্যেই যেন সবগুলো দিরহাম মদিনার মানুষকে বণ্টন করা হয়।

ভোর হবার আগেই তাঁর খাদেম এসে জানায়, তাঁর কাছে আর একটি দিরহামও অবশিষ্ট নেই। মদিনার রাস্তায় যাকে পাওয়া গেছে, তাঁকে দান করা হয়েছে।[৪]

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এত দানশীল ছিলেন যে, তাঁর দান করা দেখে মানুষজন অবাক হতো। কাবিসা ইবনে জাবির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি তালহার মতো কাউকে এত সম্পদ দান করতে দেখিনি!"[৫]

তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু খোঁজ নিতেন, তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে কেউ ঋণগ্রস্ত কিনা। আশেপাশের কোনো ঋণগ্রস্ত পেলে তিনি তাদের ঋণ পরিশোধ করতেন।

সুবাইহা আত-তাইমী ছিলেন ঋণগ্রস্ত। মানুষজন তাঁর কাছে ৩০,০০০ দিরহাম পেত। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন জানতে পারলেন, তখন তিনি সেই ঋণের দায়ভার নিলেন। সুবাইহার পক্ষে তিনি ঋণ পরিশোধ করেন।[৬]

প্রতিবছর তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে তাঁর বার্ষিক উপার্জন আসলে সেখান থেকে তিনি ১০,০০০ দিরহাম আলাদা করে উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে উপহার দিতেন।[৭]

তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু কোটি কোটি টাকা দান করতেন, কেউ বিপদে পড়লে এগিয়ে যেতেন, সাহাবিদেরকে উপহার দিতেন। তাঁর উপার্জন কেমন ছিল?

---

৪ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/১৬৮, ইমাম আহমদ, কিতাবুয যুহদ: ২/৮২।

৫ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/১৬৮।

৬ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/১৬৯।

৭ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/১৬৯।

তাঁর জীবনীকার উল্লেখ করেন, তিনি দৈনিক ১,০০০ দিরহাম উপার্জন করতেন।[৮]

দৈনিক একহাজার দিরহাম মানে অন্তত ৮ লক্ষ টাকা। সেই সম্পদ দিয়ে দিনে ৮৩টি ভেড়া কেনা যেত!

এত সম্পদ উপার্জন, দান করা সত্ত্বেও তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর অঢেল সম্পদ থেকে যায়। তিনি যখন ইন্তেকাল করেন, তাঁর সম্পদ গণনা করা হয়। দেখা যায় তাঁর নগদ সম্পদ হিসেবে রয়ে গেছে—

- ২০ লক্ষ দিনার
- ৩ কোটি দিরহাম।[৯]

তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তি টাকার হিসেবে গণনা না করে চিন্তা করুন—একজন ব্যক্তি ৪০ লক্ষ ভেড়ার মালিক! একেকটি ভেড়ার দাম গড়ে ১০,০০০ টাকা।

তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু এত সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও হাত খুলে দান করতে পেরেছিলেন। সম্পদের দুশ্চিন্তায় তাঁর ঘুম হতো না। দুশ্চিন্তা করতে করতে এমন অবস্থা হতো, তিনি ঘেমে যেতেন![১০]

দুনিয়ার আর দশজন সম্পদশালীর মতো তাঁর দুশ্চিন্তা সম্পদ হারানোর ভয়ে ছিল না। তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল-কেন তাঁর এত সম্পদ? আল্লাহর কাছে কী জবাব দিবেন এই ভয়ে তিনি সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত থাকতেন।

তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর একজন মেয়ে ছিলেন। তাঁর নাম আয়িশা বিনতে তালহা রাহিমাহাল্লাহ। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের অন্যতম সুন্দরী। তাঁকে প্রথমে বিয়ে করেন যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে মুসআব ইবনে যুবাইর রাহিমাহুল্লাহ।

---

৮ আল্লামা ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াঃ ৭/৪৪৫।

৯ তাবাকাতে ইবনে সা'দঃ ৩/১৬৯-৭০।

১০ ইমাম আহমদ, কিতাবুয যুহদঃ ২/৮২।

তালহা ও যুবাইর দুজন ছিলেন বন্ধু, দুজনই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি। এক বন্ধুর ছেলের সাথে আরেক বন্ধুর মেয়ের বিয়ে হয়।

মুসআব ইবনে যুবাইর রাহিমাহুল্লাহ তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ে আয়িশাকে বিয়ে করেন ১ লক্ষ দিনার মোহরানা দিয়ে। মুসআব ইবনে যুবাইর তখন ছিলেন ইরাকের গভর্নর।[১১]

তিনি ইন্তেকাল করলে আয়িশা রাহিমাহাল্লাহকে বিয়ে করেন উবাইদুল্লাহ আত-তাইমী রাহিমাহুল্লাহ। উবাইদুল্লাহ আত-তাইমী আয়িশাকে মোহরানাস্বরূপ দেন ১০ লক্ষ দিরহাম।[১২]

আয়িশা বিনতে তালহা রাহিমাহাল্লাহ তাঁর মোহরানার টাকা দিয়ে অন্তত ২ লক্ষ ভেড়া কিনতে পারতেন। যার অর্থমূল্য প্রায় ২০০ কোটি টাকা।

আয়িশা বিনতে তালহাকে তাঁর স্বামীদ্বয় মোহরানা বাবদ একেকজন ১০০ কোটি টাকা দিলে তাদের নিজেদের সম্পদের পরিমাণ কত ছিল?

সাহাবিদের সময় মোহরানা ছিল মূলত সামর্থ্যভিত্তিক। যার যত সামর্থ্য ছিল, তিনি তেমন মোহরানা দিতেন।

অনেক সাহাবির বিয়েতে মোহরানা অর্থমূল্যে ছিল না। রুমাইসা বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহা আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিয়ে করেন কোনোপ্রকার আর্থিক মোহরানা ছাড়া। তাদের বিয়েতে মোহরানা ছিল স্বামীর ইসলাম গ্রহণ।

আবার, একজন সাহাবির মোহরানা দেবার মতো কিছুই ছিল না। তিনি বিয়ে করেন তাঁর মুখস্থ কুরআন স্ত্রীকে শুনানো/শেখানোর মাধ্যমে।

---

১১ ইমাম আয-যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪/৩৬৯-৩৭০, আল্লামা ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/৪৮০, তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৮/৩০।

১২ ইমাম আয-যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪/৩৬৯-৩৭০, আল্লামা ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/৪৮০, তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৮/৩০।

অন্যদিকে সামর্থ্যবান সাহাবি তাদের সামর্থ্যানুযায়ী স্ত্রীকে মোহরানা দেন। ধনী সাহাবি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর স্ত্রীকে মোহরানা দেন ৩০,০০০ দিরহাম।[১৩]

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে বিয়েতে মোহরানার পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। এই সময় রোম ও পারস্য বিজয় হয়। মুসলিমদের অর্থভাণ্ডারে কোটি কোটি টাকা আসতে থাকে। ফলে, পূর্বের তুলনায় তারা অনেক বেশি মোহরানা দেওয়া শুরু করে।

খলিফা এটা নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলেন। একদিন খলিফা মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। তিনি জানিয়ে দিলেন, সাহাবিরা যেন মোহরানার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়েতে মোহরানা ছিল প্রায় চারশো দিরহাম। এখন যেন কেউ খুব বেশি মোহরানা না দেয়।

তিনি জানিয়ে দেন, "সাবধান! আমি যেন না শুনি কেউ ৪০০ দিরহামের বেশি মোহরানা নির্ধারণ করেছে!"

এটা ছিল উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খুতবার প্রথমাংশ। বেশিরভাগ মানুষ খুতবার এই অংশের উদ্ধৃতি দেয় কিন্তু পরের অংশের উদ্ধৃতি দেয় না। অনেক সাধারণ মানুষ পরের ঘটনা হয়তো জানেই না।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খুতবা শুনে কুরাইশের একজন মহিলা বললেন, "হে আমিরুল মুমিনিন! আপনি কি মানুষকে ৪০০ দিরহামের বেশি মোহরানা নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন?"

খলিফা বললেন, "হ্যাঁ।"

সেই মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি কুরআনের ঐ আয়াত পড়েননি?"

এই বলে সেই মহিলা কুরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করে শুনান: "যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে 'প্রচুর ধন-সম্পদ' প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না।" [সূরা নিসা ৪:২০]

---

১৩ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/৯৬।

এই আয়াতের উদ্ধৃতি দিলে উমর ইবনুল খাত্তাব তাঁর পূর্বের অবস্থান থেকে সরে আসেন।

তিনি শুধু ব্যক্তিগতভাবেই সরে আসেননি, আবার মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিয়ে জানিয়ে দেন, তিনি তাঁর আগের অবস্থান থেকে সরে এসেছেন।

মহিলার কথা শুনে তিনি বলেন, "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। উমরের চেয়ে তো প্রত্যেকেই অনেক বেশি জানে।"

তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে পুনরায় খুতবা দেন: "হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে ৪০০ দিরহামের বেশি মোহর দিতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু, এখন বলছি যে, যে কোনো লোক তার সম্পদ থেকে ইচ্ছেমতো মোহরানা নির্ধারণ করতে পারবে।"[১৪]

সাহাবি-তাবেয়িদের যুগে মোহরানা নির্ধারণের সময় পাত্রের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করা হতো। কিন্তু, আমাদের সময় এই দিকটা অনুপস্থিত। এমনও হয়, মোহরানা নির্ধারণ করা হয় ১০ লক্ষ টাকা। অথচ পাত্র তার সারাজীবনে এত টাকা উপার্জন করেনি। যার ফলে সে মোহরানা পরিশোধ করতে পারে না।

আমাদের সমাজে প্রায় ৯০% মোহরানা অপরিশোধিত থেকে যায়। এটার পেছনে অন্যতম কারণ উভয় পক্ষের সদিচ্ছার অভাব। মোহরানাকে কেবলমাত্র লোকদেখানোর বস্তু বানানো হয়েছে। এতে করে কাগজে-কলমে মোহরানার পরিমাণ থাকে বেশি, পরিশোধ হয় কম।

পাত্রের সামর্থ্যানুযায়ী যদি ৫০ হাজার, ১ লক্ষ, দেড় লক্ষ টাকা মোহরানা নির্ধারণ করা হতো, তাহলে সেটা পরিশোধ করা সম্ভব হতো। এতে করে পাত্রও দায়মুক্ত হতো, পাত্রীও তার আর্থিক অধিকার বুঝে পেত।

---

১৪ তাফসীর ইবনে কাসির: ২/৩১৬ (সূরা নিসার ২০ নাম্বার আয়াতের তাফসীর), মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক: ১০৪২০, ইমাম কুরতুবি, আল-জামিউ লি-আহকামিল কুরআন: ৫/৯৫, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, তাফসীরে দুররুল মানসুর: ২/১৩৩, যামাখশারী, তাফসীরে কাশশাফ: ১/৩৫৭।

হালালভাবে সম্পদ উপার্জন করে যারা কোটিপতি হয়, তারা যদি তাদের স্ত্রীকে কয়েক লক্ষ বা কোটি টাকা দেয়, সেটা হবে তাদের সামর্থ্যানুযায়ী, উভয়ের আর্থিক স্ট্যাটাস অনুযায়ী।

নারীদের হাতে সম্পদ থাকলে তারা কী করে?

মুসলিম ইতিহাসে দেখা যায় নারীরা তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে তুলেছে কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদরাসা। তারা যখন ঠিকমতো মোহরানা পেত, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো, তখন গড়ে তুলত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এরকম একজন নারী ছিলেন ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ আল-ফিহরী রাহিমাহাল্লাহ। তাঁর বাবা মুহাম্মদ আল-ফিহরী ছিলেন ফাস শহরের (বর্তমান তিউনিসিয়ার) একজন বড় ব্যবসায়ী। বাবার ইন্তেকালের পর তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন ফাতিমা এবং তাঁর বোন মারিয়াম।

দুই বোনের হাতে বাবার কোটি কোটি টাকার সম্পদ আসে। এত টাকা দিয়ে তারা কী করবেন?

ফাতিমা আল-ফিহরী নিজে একজন মুহাদ্দিসা ছিলেন, ফিকহেও পারদর্শী ছিলেন। একজন আলেমা হিসেবে তিনি অনুভব করেন তাঁর শহরে একটি বড় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করবেন। বাবার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে মাদরাসার জন্য জমি কিনেন। সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখেন তাঁর প্রতিষ্ঠানে যেন হারাম কিছু প্রবেশ না করে।

মাদরাসা নির্মাণে কয়েকবছর লেগে যায়। সেই সময়গুলোতে ফাতিমা প্রায় প্রতিদিন রোজা রাখতেন (নারী হিসেবে যতদিন রাখা যায়)।

২৪৫ হিজরির রমজান মাসের ১ তারিখ মাদরাসাটি উদ্বোধন করা হয়। মুসলিম নারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাদরাসা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব অর্জন করেন ফাতিমা আল-ফিহরী।[১৫]

ফাতিমার আরেক বোন মারিয়াম। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে এক বোন প্রতিষ্ঠা করেন মাদরাসা,

---

১৫ কাযী আতহার মুবারকপুরী, ইসলামে নারীর ইলমী অবদান: ৮০-৮৮।

আরেক বোন প্রতিষ্ঠা করেন মসজিদ। মসজিদটি 'জামেউল আন্দালুস' নামে পরিচিত।[১৬]

মক্কার চিফ জাস্টিস ছিলেন শায়েখ শিহাবুদ্দীন তাবারী রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর মেয়ে উম্মে হুসাইন রাহিমাহাল্লাহ ছিলেন একজন হাদিস বিশেষজ্ঞ এবং ফেকাহবিদ। তিনি মক্কায় একটি এতিমখানা নির্মাণ করেন, যেখানে এতিমরা থাকতে পারবে, খেতে পারবে, পড়াশোনা করতে পারবে। এই কাজটি যাতে নির্বিঘ্নে হয় এজন্য উম্মে হুসাইন মক্কা ও মক্কার বাইরে অনেক সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে যান।[১৭]

মিসরের সুলতান নাসের মুহাম্মদ ইবনে মালিকের মেয়ে ৭৬১ হিজরিতে মিসরে 'মাদরাসাতুল হেজাযিয়্যাহ' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদরাসায় একটি বড় লাইব্রেরি ছিল যেখানে অনেক গ্রন্থ ওয়াক্ফ করা হয় যাতে মানুষ নির্বিঘ্নে জ্ঞানার্জন করতে পারে।[১৮]

খলিফা নাসির লিদীনিল্লাহ আহমদের মায়ের নাম ছিল যামরাদ। তুর্কি বংশোদ্ভূত এই নারী একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[১৯]

তুরকান বিনতে মালিক ছিলেন বাদশাহ আশরাফ মুসার স্ত্রী। তিনি সিরিয়ায় মাকামে জাবালে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদরাসাটি তাঁর নামেই প্রসিদ্ধ ছিল এবং এই মাদরাসার প্রাঙ্গণে তাঁকে দাফন করা হয়।[২০]

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী রাহিমাহুল্লাহর বোন ছিলেন রাবিয়া খাতুন রাহিমাহাল্লাহ। তিনিও সিরিয়ায় মাকামে জাবালে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই মাদরাসার প্রাঙ্গণে তাঁকেও দাফন করা হয়।[২১]

---

১৬ কাযী আতহার মুবারকপুরী, ইসলামে নারীর ইলমী অবদান: ৮০।
১৭ কাযী আতহার মুবারকপুরী, ইসলামে নারীর ইলমী অবদান: ৮১।
১৮ কাযী আতহার মুবারকপুরী, ইসলামে নারীর ইলমী অবদান: ৮৭।
১৯ কাযী আতহার মুবারকপুরী, ইসলামে নারীর ইলমী অবদান: ৮৭।
২০ কাযী আতহার মুবারকপুরী, ইসলামে নারীর ইলমী অবদান: ৮৭।
২১ কাযী আতহার মুবারকপুরী, ইসলামে নারীর ইলমী অবদান: ৮৮।

তাবুজ্জামান হাবশিয়্যাহ নামে খলিফা মুস্তাজি বিআমরিল্লাহ হাসানের একজন দাসী ছিল। তাবুজ্জামান হাবাশিয়্যাহ মক্কায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন ৫৮০ হিজরিতে।[২২]

উসমানি সুলতান মুরাদ শাহের মা ইস্কাদার শহরে বিশাল একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদরাসার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তৎকালীন বিশ্বের নানান প্রান্ত থেকে আলেমগণ জড়ো হন। সুলতানের মা সবাইকে ১,০০০ দিনার হাদিয়া দেন![২৩]

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগত ৫০ জন আলেমকে সেই মাদরাসার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

খাতুন উম্মে সালেহ নামে দামেস্কের একজন নারী একটি বিশেষ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মাদরাসায় কেবলমাত্র ইলমে তাজবীদ ও ইলমে কেরাতের ওপর ক্লাস নেওয়া হতো।[২৪]

এছাড়াও মুসলিম ইতিহাসে অনেকগুলো মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পেছনে নারীরা অবদান রাখেন। আব্দুল কাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে একজন নারী তাঁর মোহরানার টাকার বিনিময়ে স্বামীকে দিয়ে কাজ করান সেই মাদরাসায়। তাঁর স্বামীর মোহরানা পরিশোধের সামর্থ্য ছিল না। ফলে, তিনি আব্দুল কাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর মাদরাসায় কাজ করেন। তাঁর স্ত্রী এটাকেই নিজের মোহরানা বাবদ হিসেব করেন।

বাংলাদেশে অনেক মসজিদ, মাদরাসা নারীদের প্রতিষ্ঠিত। ঢাকায় ৮৬১ হিজরিতে সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের মেয়ে মুসাম্মাত বখত বিনতে বিবি একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন পুরান ঢাকায়।

মধ্যযুগে নারীরা তাদের মোহরানার টাকা এবং সম্পত্তি বিক্রি করে মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করতেন। তৎকালীন সমাজে নারীদেরকে

---

২২ কাযী আতহার মুবারকপুরী, ইসলামে নারীর ইলমী অবদান: ৮৮।
২৩ কাযী আতহার মুবারকপুরী, ইসলামে নারীর ইলমী অবদান: ৮৭।
২৪ কাযী আতহার মুবারকপুরী, ইসলামে নারীর ইলমী অবদান: ৮৭।

উত্তরাধিকার সম্পত্তি ঠিকমতো দেওয়া হতো, মোহরানা ঠিকমতো দেওয়া হতো বলেই তারা এমন উদ্যোগ নিতে পারতেন।

আইয়ুবী শাসনামলে দামেস্কের নারীরা ২৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন, যার মধ্যে ১৫টি মাদরাসা ছিল।[২৫]

নারীদের এসব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অর্থ আসে তাদের মোহরানা এবং পৈতৃক-স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারের অংশ থেকে।

৩৬ হিজরিতে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাতবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৪ বছর। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন কিশোর বয়সে। বর্তমান সময়ে যে বয়সে শিক্ষার্থীরা SSC-HSC পরীক্ষা দেয়, সেই বয়সে তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবি হবার মর্যাদালাভ করেন। সেই বয়সে তিনি ব্যবসা শুরু করেন। শুধু ব্যবসা শুরু করেননি, ব্যবসা করার জন্য 'ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরে' যান। মক্কা থেকে যান বসরায়।

জাফর ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু মূতার যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর ছেলে ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু। জাফর ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিবারের কাছে গেলেন। তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিলেন। তারা যেন রিজিকের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা না করে, সেই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে মনোবল শক্ত রাখতে বলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন ছোট্ট শিশু। সেই সময় থেকে তিনি পরিবারের হাল ধরেন। মদিনায় ব্যবসা শুরু করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাতিজা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দেখলেন তাঁর পরিবারের একজন মদিনায় ব্যবসা করছেন, তার ওপর আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু

---

২৫ Yossef Rapoport, Marriage, Money and Divorce in Medieval Islamic Society, Page 23।

তখন কিশোর। বয়স ১০-১২ বছর হবে। তখন তিনি কী বলবেন? এটা কি মান-সম্মানের প্রশ্ন? তিনি ছোট্ট আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরকে বলবেন ব্যবসা না করে ঘরে বসে থাকতে?

না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরের স্বাধীন পেশা পছন্দ করলেন। ছোট্টবেলা থেকে আব্দুল্লাহ নিজ পরিবারের দায়িত্ব নিচ্ছেন, এটাকে তিনি বাঁকা চোখে তো দেখেননি, বরং তাঁকে উৎসাহ দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরের জন্য দু'আ করেন—"আল্লাহ আব্দুল্লাহর ব্যবসায় বরকত দান করুন।"[২৬]

ছোটরা অনেক সময় দায়িত্ব নিতে চায়। তাদের ব্যক্তিগত জীবন, দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা বুঝে তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া দরকার। শিশুদেরকে ননির পুতুল হিসেবে গড়ে তুললে হবে না। মাঝেমধ্যে চিনি-বিস্কিট নিয়ে আসার জন্য তাদেরকে দোকানে পাঠানো যেতে পারে; যদি দোকানে একা যাওয়া-আসার পর্যাপ্ত নিরাপত্তা থাকে।

আমাদের আশেপাশে অনেক এতিম ছেলে দেখতে পাই; যেমনটা ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু। তারা অন্যান্য ছেলে-মেয়ের তুলনায় জীবন-যুদ্ধ অনেক তাড়াতাড়ি শুরু করে। ব্যবসা করে, চাকরি করে অর্থোপার্জনের চেষ্টা চালায়। তাদেরকে নিরুৎসাহিত না করে বরং উৎসাহিত করা উচিত।

---

২৬ Dr. Ali As-Sallabi, The Noble Life of Prophet, Page 1662।

যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু

"একটি দিনার কাউকে দান করার চেয়ে একেকজনের কাছে ধার দেওয়াই আমার কাছে বেশি প্রিয়। কেননা, দান করলে সওয়াব পাবে দান করার সময়। অন্যদিকে, ধার দিলে যতক্ষণ ঋণ গ্রহীতার কাছে থাকবে, ততক্ষণ সওয়াব পাবে।"

-আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)

যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফাত ভাই। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর ফুফু সাফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহার ছেলে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাওয়াতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সেই সময় ইসলাম গ্রহণকারী চতুর্দশ বা পঞ্চদশ ব্যক্তি ছিলেন যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু।[১]

তিনি আবিসিনিয়া এবং মদিনায় দুই জায়গায়ই হিজরত করেন। মদিনায় হিজরতের পর তাঁর প্রথম সন্তান আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন; যিনি ছিলেন মদিনায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম মুহাজির সাহাবি।

যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সবকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধে তিনি হলুদ পাগড়ি পরে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে ফেরেশতারাও হলুদ পাগড়ি পরে যুদ্ধে অংশ নেয়।[২]

---

১ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/৭৬।

২ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/৭৭।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে মদিনায় একখণ্ড জমি দান করেন। তাছাড়া তাঁকে একটি জমি দান করা হয়, যেখানে তিনি কৃষি কাজ করতেন, ফল-ফসল উৎপন্ন করতেন।[৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে যে জমি দান করেন, সেটা ছিল বনু নাজিরের। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে 'জুরফ' নামক জায়গার জমি দান করেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে 'আকীক' নামক জায়গায় জমি দান করেন।[৪]

যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন দুনিয়ার বুকে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি তথা আশারায়ে মুবাশশারার একজন।[৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলেন:

> *"প্রত্যেক নবির জন্য বিশেষ সাহায্যকারী থাকে। আমার বিশেষ সাহায্যকারী যুবাইর ইবনুল আউয়াম।"*[৬]

যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন মানুষের কাছে বিশ্বস্ত। তখনকার যুগে মানুষ সঞ্চয় করার জন্য ব্যাংকে টাকা রাখত না, টাকা রাখত বিশ্বস্ত মানুষের কাছে। যুবাইর ইবনুল আউয়ামের কাছে সাহাবিরা আমানত রাখতে আসলে তিনি বলতেন, "এগুলো আমাকে আমানত হিসেবে না দিয়ে ঋণ হিসেবে দাও। কারণ, আমার ভয় হয়—তোমার আমানত নষ্ট হয়ে যেতে পারে।"[৭]

আমানত নষ্ট হয়ে গেলে এর দায়ভার আমানত গ্রহীতার না। কিন্তু, ঋণ নেবার পর ঋণের দায়ভার ঋণ গ্রহীতার। যুবাইর ইবনুল আউয়াম দায়িত্ব নিতে চাইতেন। যার কারণে তিনি আমানতের চাইতে ঋণ নেওয়া পছন্দ করতেন। এতে করে তিনি অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ পাবেন। কিন্তু, সেটা যদি আমানত হতো, তাহলে তাঁকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হতো, চাওয়া মাত্র ফেরত দিতে হতো।

---

৩ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/৭৭।
৪ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/৭৮।
৫ জামে' তিরমিজি: ৩৭৪৭।
৬ সহিহ বুখারি: ২৮৪৭।
৭ সহিহ বুখারি: ৩১২৯।

মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত ঋণ নিয়ে তিনি জমি কিনেন। সেই সময় যেখানে ইসলামের সীমানা মদিনা থেকে সুদূর মিসর, ফিলিস্তিন পৌঁছে যায়। তখনকার পৃথিবীর নানান প্রান্তে যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুর জমি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

- মদিনায় তাঁর ১১টি বাড়ি ছিল
- বসরায় ২টি
- গাবায় ১টি
- কুফায় ১টি
- মিসরে ১টি।[৮]

বর্তমান যুগের সংজ্ঞায় যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যবসা ছিল জমি কেনা-বেচা ব্যবসা। ঋণের অর্থ দিয়ে তিনি জমি কিনে রাখতেন যাতে পরবর্তীতে সেগুলো বিক্রি করা যায়।

জমি কেনা-বেচা একটি লাভজনক ব্যবসা, যদি পর্যাপ্ত মূলধন থাকে। জমির দাম সাধারণত কয়েক বছরের মধ্যে দ্বিগুণ, তিনগুণ বেড়ে যায়। প্রতিবছর জমির দাম বাড়তে থাকে। সেই জায়গায় অবকাঠামো নির্মাণ হলে সেটার দাম রাতারাতি বেড়ে যায়।

বাংলাদেশে মুন্সীগঞ্জ জেলার মাওয়া এবং শরীয়তপুর জেলার জাজিরা প্রান্তের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছে পদ্মা বহুমুখী সেতু। প্রায় ১ যুগের ব্যবধানে এই দুই জেলার জমির দাম বেড়েছে ১৫ থেকে ২০ গুণ।[৯]

আগে যে জমির দাম ছিল ৪ লক্ষ টাকা, বর্তমানে সেটা ৬০ থেকে ৮০ লক্ষ টাকা! অবকাঠামোগত কারণে জমির দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়াও স্বাভাবিকভাবে জমির দাম এক যুগের ব্যবধানে দ্বিগুণ বা তিনগুণ হয়।

সাহাবিদের যুগেও জমির দাম স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিকভাবে বাড়ত। যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু গাবায় একটি জমি

---

৮ সহিহ বুখারি: ৩১২৯, তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/৮১।

৯ দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ জুলাই ২০২২, স্বপ্নের পদ্মা সেতু: বাড়ছে দুই পাড়ের জমির দাম।

কিনেন ১ লক্ষ ৭০ হাজার দিরহাম দিয়ে। তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু পিতার ঋণ পরিশোধের সময় জমিটি বিক্রি করেন ১৬ লক্ষ দিরহামে।[১০] জমির দাম ৯ গুণের বেশি বৃদ্ধি পায়।

জামাল যুদ্ধের আগে যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বড় ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দায়িত্ব দিয়ে যান, ছেলে যেন তাঁর ঋণ পরিশোধ করে। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর বলেন, "তিনি নগদ কোনো দিনার বা দিরহাম রেখে যাননি!"

তখনকার সময় সবাই জানত যে, যুবাইর ইবনুল আউয়ামের কাছে মানুষ অনেক অর্থ পায়, তিনি অনেক ঋণ করেছেন। এটাও জানত, ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁর কাছে অর্থ নেই। বাবা শাহাদাতবরণের পর ছেলে হিসাব করে দেখলেন বাবার ঋণের পরিমাণ ২২ লক্ষ দিরহাম![১১]

২২ লক্ষ দিরহাম কত টাকা? সাহাবিদের যুগে ১২ দিরহামে একটি ভেড়া কেনা যেত। তাঁর ঋণের অর্থ দিয়ে ১ লক্ষ ৮০ হাজারের বেশি ভেড়া কেনা যেত। সেই যুগের প্রায় ১৮০ কোটি টাকা ছিল যুবাইর ইবনুল আউয়ামের ঋণের পরিমাণ!

পরিমাণটা এত বেশি ছিল যে, কোনো কোনো সাহাবি ধরে নেন—আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাবার ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবি হাকিম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে জিজ্ঞেস করেন, "ভাতিজা, তোমার বাবার ঋণের পরিমাণ কত?"

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু পুরোটা না বলে বললেন, "১ লক্ষ দিরহাম।" ২২ ভাগের ১ ভাগ। এটা শুনেই তিনি বললেন, "আমার মনে হয় না এই সম্পদ দ্বারা ঋণ পরিশোধ করতে পারবে।"

এটা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর আসল পরিমাণ বললেন, "আমি যদি বলি, ঋণের পরিমাণ ২২ লক্ষ দিরহাম, তাহলে?"

---

১০ সহিহ বুখারি: ৩১২৯।

১১ সহিহ বুখারি: ৩১২৯।

হাকিম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর চক্ষু চড়কগাছ! তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! আমার মনে হয় না তোমরা এই ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য রাখো। আমার সহযোগিতা লাগলে বলবে।"[১২]

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাবার জমি বিক্রি শুরু করলেন। গাবায় অবস্থিত জমিটি বাবা কিনেছিলেন ১ লক্ষ ৭০ হাজার দিরহাম দিয়ে, তিনি সেটা বিক্রি করেন ১৬ লক্ষ দিরহামে। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ৪ লক্ষ দিরহামের ঋণ পরিশোধ করেন। গাবার অবশিষ্ট সাড়ে চার ভাগ জমি বিক্রি করেন চারজন সাহাবির কাছে। জমির এক অংশের দাম নির্ধারণ করা হয় ১ লক্ষ দিরহাম। যে চারজন সাহাবি তাঁর জমি কিনেন, তারা হলেনঃ

- মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু দেড় অংশ দেড় লক্ষ দিরহামে
- মুনযির ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক অংশ এক লক্ষ দিরহামে
- আমর ইবনে উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু এক অংশ এক লক্ষ দিরহামে
- আব্দুল্লাহ ইবনে জাম'আহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এক অংশ এক লক্ষ দিরহামে।[১৩]

এক জমি বিক্রি করেই আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাবার বেশিরভাগ ঋণ পরিশোধ করেন। তারপরও তিনি পৈতৃক সম্পত্তি বণ্টন করলেন না। সবাই যখন আবদার করল, তিনি বললেন আরও ৪ বছর অপেক্ষা করবেন। প্রতিবছর হজের মৌসুমে ঘোষণা দেওয়া হতো তাঁর বাবার কাছে কেউ ঋণ পেলে সে যেন তাঁর কাছে আসে। কেননা, হজের সময় পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে মানুষ হজ করতে আসত। যার ফলে, সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করার সুযোগ ছিল। যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যবসা, ঋণ যেহেতু শুধুমাত্র মদিনাকেন্দ্রিক ছিল না, এজন্য মদিনার বাইরে লোকজনের কাছেও ঘোষণা করা হয় তারা তাঁর কাছে অর্থ পেত কিনা।

---

১২ সহিহ বুখারিঃ ৩১২৯।

১৩ সহিহ বুখারিঃ ৩১২৯।

চার বছরে সবার ঋণ পরিশোধ শেষে সম্পদ বণ্টন করার জন্য সমস্ত সম্পদ হিসাব করা হয়। দেখা যায় ঋণ পরিশোধ শেষে যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্পদ বাকি থাকে ৫ কোটি ২ লক্ষ দিরহাম![১৪]

এই অর্থ দিয়ে সেই সময় অন্তত ৪১ লক্ষ ভেড়া কেনা যেত। একেকটি ভেড়ার মূল্য ১০ হাজার টাকা ধরলে যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকালের পূর্বে বণ্টনযোগ্য সম্পদ রেখে যান প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার বেশি!

যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের সময় তাঁর ৪ জন স্ত্রী ছিল। প্রত্যেক স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির অংশ থেকে যায় পান, সেটা দাঁড়ায় ১২ লক্ষ দিরহাম। সেই যুগে মদিনার যেসকল নারী কোটিপতি ছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন যুবাইর ইবনুল আউয়ামের স্ত্রীগণ। স্বামীর সম্পত্তির ভাগে তারা যে বিশাল অর্থ পান, তেমন অর্থ তখনকার যুগের অনেক নারীর ছিল না।

জীবদ্দশায় যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুর এত জমি, বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তিনি ভোগবিলাসে লিপ্ত হননি বা সম্পদের নেশায় মত্ত থাকেননি। যারা জমির ব্যবসা করে, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হালাল-হারাম, মানুষের হকের ব্যাপারে পরোয়া করে না। কীভাবে সম্পদ আত্মসাৎ করতে হয়, কীভাবে অন্যের হক নষ্ট করতে হয় এগুলো নিয়ে তারা চিন্তা করে। কিন্তু, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু অর্থের উৎসের ব্যাপারে ছিলেন বেশ সতর্ক। তাঁর কাছে অর্থ আসলেই সেটা গ্রহণ করতেন না, বরং কোন উৎস থেকে সেই অর্থ এসেছে সেটা যাচাই করতেন।

যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুর অধীনে ১,০০০ মামলুক ছিল। তারা তাঁকে খারাজ (ভূমিকর) দিত। কিন্তু, তিনি সেসব অর্থ নিজে ভোগ করতেন না। প্রতিরাতে খারাজের সমস্ত সম্পদ তিনি

---

১৪ সহিহ বুখারি: ৩১২৯।

মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। বাড়িতে যখন ফিরতেন, তাঁর কাছে তখন কোনো অর্থ থাকত না।[১৫]

যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন একজন সাহাবি ছিলেন, যিনি দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ পান; একইসাথে ছিলেন প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক। তিনি দুনিয়ার মোহে পড়েননি। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার চেয়ে চিরস্থায়ী জান্নাত ছিল তাঁর কাছে আকাঙ্ক্ষিত। এ কারণেই মূলত সাহাবিদের কাছে অঢেল সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও তারা পুঁজিবাদী মানসিকতার অধিকারী ছিলেন না।

---

১৫ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহদ: ২/৮০।

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু

"হালাল জীবিকা অন্বেষণ করতে গিয়ে যে ব্যক্তি ক্লান্ত অবস্থায় রাত্রিযাপন করে, সে তো ক্ষমাপ্রাপ্ত হিসেবে রাত্রিযাপন করে।"

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় বা তৃতীয় সর্বোচ্চ হাদিস বর্ণনাকারী। তাঁর ওপরে ছিলেন শুধুমাত্র আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু।

আনাস ইবনে মালিকের পরিবার আনসারি সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত পরিবার। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের দশ বছর পূর্বে মদিনার খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখায় জন্মগ্রহণ করেন।[১]

আনাস ইবনে মালিকের মা ছিলেন আনসারি নারী সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। তাঁর নাম উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি আনসারি নারীদের মধ্যে সম্ভবত প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পূর্বে এমনকি আকাবা শপথের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা জানা যায় না।

আনাস ইবনে মালিকের বাবা মালিক ইবনে নদর ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাঁর স্ত্রী উম্মু সুলাইম ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি প্রচণ্ড

---

১ ইবনে হাজার আসকালানী, আল-ইসাবাহ ফি তামযিজিস সাহাবাহ: ১/৭১।

রাগান্বিত হন। স্ত্রীর ওপর রাগ করে তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যান এবং পথিমধ্যে তার কোনো এক শত্রু তাকে হত্যা করে।[২]

উম্মু সুলাইম বিনতে মিলহান বিধবা হন। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পূর্বের ঘটনা। 'উম্মু সুলাইম' ছিল তাঁর ডাকনাম। তাঁর আসল নাম কী ছিল সেটা নিয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। যেমন—সাহলা, রুমাইলা, রুমাইসা, সুলাইকা, আল-ফায়সা ইত্যাদি।[৩] তবে তাঁর প্রসিদ্ধ নাম রুমাইসা বিনতে মিলহান; সহিহ বুখারিতে তাঁর এই নাম পাওয়া যায়।[৪]

স্বামী মারা যাবার পর রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহা সিদ্ধান্ত নেন, তিনি আর বিয়ে করবেন না। ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। তবে ছেলে যদি চায়, তাহলে সিদ্ধান্ত বদলাতে পারেন।

কিছুদিন পর তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন যায়িদ ইবনে সাহিল নামে মদিনার এক ধনকুবের। তার আরেক নাম ছিল আবু তালহা। একে তো তিনি ছিলেন ধনী, তার ওপর সাহসী। তখনকার সময়ে পাত্র নির্বাচনে সাহসিকতা প্রাথমিক বিবেচনায় নেওয়া হতো। যায়িদ ইবনে সাহিলের মদিনায় একটি সুন্দর বাড়িও ছিল। বাড়িটি এতটাই সুন্দর ছিল যে, সবাই এই বাড়িটির প্রশংসা করত। সবকিছু বিবেচনায় যায়িদ ইবনে সাহিল বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, তার মতো সু-পাত্রকে রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। কিন্তু রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহা যায়িদকে প্রত্যাখ্যান করে বসেন। রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

> *'তোমার মতো মানুষ, যে কিনা এখনো একজন কাফের, তাঁকে আমি কীভাবে আমার স্বামী হিসেবে গ্রহণ করব?'*

---

২ ইবনে হাজার আসকালানী, আল-ইসাবাহ ফি তাময়িজিস সাহাবাহ: ৪/৪৬১।

৩ সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/৩৪০।

৪ সহিহ বুখারি: ৩৬৭৯।

যায়িদ ভাবলেন, হয়তো রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহা অন্য কাউকে বিয়ে করবেন বলে তার প্রস্তাবে রাজি হচ্ছেন না। তিনি অভিমানের সুরে বললেন, 'কী এমন আছে, যা আমাকে বিয়ে করতে তোমাকে বাধা দিচ্ছে? সেটা কি সোনা-রুপা?'

'সোনা-রুপা?' যায়িদের কথা শুনে রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহা অপমানবোধ করলেন। তিরস্কার করে বললেন,

> *'আল্লাহর কসম! হে আবু তালহা, আমি আল্লাহ আর তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শপথ করে বলছি, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো তাহলেই কেবল আমি তোমাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করব। আমাকে সোনা-রুপা কিছুই দেওয়া লাগবে না। তোমার ইসলাম গ্রহণকেই আমি আমার মোহরানা হিসেবে ধার্য করব।'*

আবু তালহা বুঝতে পারলেন তার ধন-সম্পদের প্রতি রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহার কোনো লোভ নাই। রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করতে হলে তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। বিয়ে করার জন্য পিতৃধর্ম ছেড়ে দেবেন কিনা সেটা নিয়ে যখন যায়িদ চিন্তা করছেন, তখন সুযোগ পেয়ে রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে বললেন, 'হে আবু তালহা, তুমি কি জানো না যে, যে ইলাহর তুমি ইবাদত করো সেটি মাটির তৈরি?' রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে সুর মিলিয়ে আবু তালহা বললেন, 'হ্যাঁ, তা ঠিক'। রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলে চললেন, 'একটা গাছের পূজা করতে তোমার লজ্জা করে না? যেখানে গাছটির এক অংশ আগুনে জ্বালিয়ে রুটি বানিয়ে খাও। হে আবু তালহা! তুমি ইসলাম গ্রহণ করে নাও, তাহলে আমি সন্তুষ্টচিত্তে তোমাকে আমার স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে নেবো। আর মোহরানা হিসেবে আমি তোমার কাছে আর কিছুই চাইব না।'

রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহার এবারের কথাগুলো আবু তালহাকে নাড়া দিলো। রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলে গেলেন, তিনি প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখবেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে আবু তালহা ঘোষণা করলেন—আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না

মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। ছেলের অনুমতি নিয়ে রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহা আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিয়ে করেন।[৫]

সাহাবিরা এই বিয়ের ব্যাপারে বলা শুরু করে, "ইসলামে এই বিয়ের মোহরের মতো শ্রেষ্ঠ মোহর আর কারো নেই।"

ইসলামে মোহরানা শুধুমাত্র আর্থিক হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। রুমাইসা বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ের ঘটনাটি একটি উদাহরণ, এছাড়াও আরও অনেক উদাহরণ আছে। একবার এক সাহাবির সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক নারীর বিয়ে দেন। পাত্রের মোহরানা পরিশোধের সামর্থ্য ছিল না। তাঁর কুরআন মুখস্থকে মোহরানা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।[৬*]

আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করার পর মক্কায় যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মক্কায় ছিলেন। তিনি আকাবা শপথে অংশগ্রহণ করেন যেখানে আরও প্রায় সত্তর জন আনসারি সাহাবি ছিলেন। বদর, উহুদ, খন্দক সহ প্রায় সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ কণ্ঠের অধিকারী। ফলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলতেন—

---

৫ ইবনে হাজার আসকালানী, আল-ইসাবাহ ফি তাময়িজিস সাহাবাহ: ৪/৪৬১।

৬ সহিহ বুখারি: ৫০২৯।

* আবু হানিফা, মালেক, আহমাদ বিন হাম্বলের একটি মত, ইসহাক, মাকহুল প্রমুখ অর্থাৎ, জমহুরের মতে, মাহরকে অবশ্যই এমন হতে হবে যার আর্থিক মূল্যমান আছে। এজন্য কুরআন তেলাওয়াত বা অন্যান্য অবস্তুগত বিষয় মাহর হওয়ার যোগ্য নয়। তাদের দলিল হলো, কুরআনের আয়াত, আহজাব : ৫০, এবং বিভিন্ন হাদিস, যেখানে রাসূলুল্লাহ সা. একটি লোহার আংটি বা এধরনের অল্প মাল হলেও মাহর হিসেবে সংগ্রহ করতে বলেছেন। হানাফিদের মতে, মাহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম। ইমাম শাফেয়ীর মতেও মাহর মূল্যমান সম্পন্ন হতে হবে তবে এই হাদিসগুলোর জন্য তিনি কুরআনুল কারিমকে মাহর হিসেবে স্বীকৃতি দেন, বাকিরা কুরআন ও স্বীকৃত সুন্নাহর বিপরীতে খবরে আহাদ বলে পরিত্যাগ করেন।

> *"মুশরিকদের জন্য আবু তালহার একটি হুংকার একদল সৈন্যের চেয়েও ভয়ঙ্কর।"*[৭]

আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন দক্ষ তীরন্দাজ। উহুদ যুদ্ধে যখন চারিদিক থেকে শত্রুবাহিনী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়ছিল, তখন আবু তালহা মানব দেয়াল হয়ে রাসূলুল্লাহকে রক্ষা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

> *"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্য আমার মা-বাবা কুরবান হোক। আপনি মাথা উঠাবেন না; এমন না হয় শত্রুপক্ষের তীর এসে আপনার গায়ে লাগে। আপনার বক্ষ রক্ষার্থে আমার বক্ষ নিবেদিত।"*[৮]

আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে অনেক বিখ্যাত ঘটনা আছে। তারমধ্যে দুটো ঘটনা উল্লেখ করছি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ একটি আয়াত নাজিল করেন। আয়াতটি হলো:

"তোমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালোবাসো। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।" [সূরা আলে ইমরান ৩: ৯২]

আয়াতটি শোনার পর আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যান। তাঁকে গিয়ে বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! মসজিদে নববির পাশে 'বায়রুহা' নামক বাগানটি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।"

আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনেক বাগান ছিল। তারমধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বাগান 'বায়রুহা'। উল্লেখ্য, সাহাবিরা তাঁদের পোষা

---

৭ ইবনে আসীর, উসদুল গাবাহ মা'রিফাতিস সাহাবাহ: ৫/২৩৫।

৮ সহিহ মুসলিম: ৪৫৭৭।

প্রাণী এমনকি বাগানগুলোর নামকরণ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর পোষা প্রাণীর নাম রাখতেন।

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোড়ার নাম ছিল 'লুহাইফ'[৯]। গাধার নাম ছিল 'উফাইর'[১০]। উটের নাম ছিল 'আযবা'[১১], 'ক্বাসওয়া'[১২]।
- আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘোড়ার নাম ছিল 'জারদা'[১৩], আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘোড়ার নাম ছিল 'মানদূব'[১৪]।

আপনি যদি মসজিদে নববির পেছনের দরজা কিং ফাহাদ গেইট দিয়ে প্রবেশ করেন, সেখান থেকে বামদিকে ১৫০ ফুট হাঁটেন, তাহলে দেখতে পাবেন 'বায়রুহা' বাগানটি। আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বাগানটি আল্লাহর রাস্তায় দান করেন। তিনি বলেন, "এটা আল্লাহর নামে সদকা করা হলো, আমি এর দ্বারা কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য সঞ্চয়রূপে থাকবে। কাজেই, আপনি যাকে দান করলে ভালো মনে হয় তাকে দান করুন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু তালহার দানকে স্বাগত জানালেন। তিনি বললেন, "তোমাকে ধন্যবাদ। এটা হচ্ছে লাভজনক সম্পদ, এটা হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ, তা শুনলাম। আমি মনে করি, তোমার আপনজনদের মধ্যে তা বণ্টন করে দাও।"[১৫]

আবু তালহা ছিলেন খাযরাজ গোত্রের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁর আত্মীয়-স্বজন অনেকেই গরিব ছিলেন। ফলে, তিনি তাঁর বাগানটি আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ভাগ করে দেন।

---

৯ সহিহ বুখারিঃ ২৮৫৫।
১০ সহিহ বুখারিঃ ২৮৫৬।
১১ সহিহ বুখারিঃ ২৮৭১।
১২ সহিহ মুসলিমঃ ২৮৪০।
১৩ সহিহ বুখারিঃ ২৮৫৪।
১৪ সহিহ বুখারিঃ ২৮৫৭।
১৫ সহিহ বুখারিঃ ১৪৬১।

আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের ইতিহাসে প্রথম 'ওয়াক্‌ফ' করেন। এই হাদিস হলো ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত প্রথম হাদিস। ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা হলো ইসলামি ব্যবস্থা। পাশ্চাত্যের লোকজন এটা জানত না। বর্তমানে এই ব্যবস্থা অনুসরণ করে পাশ্চাত্য অনেক সুফল পাচ্ছে। বিশেষত জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এতে করে তারা স্বাধীনভাবে জ্ঞানচর্চা করতে পারে। মুসলিম সভ্যতার জ্ঞানার্জনের ইতিহাসে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে সম্পদশালী ওয়াক্‌ফ হলো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের।

ওয়াক্‌ফের সম্পদের মালিকানা একজন ব্যক্তির থাকে না। এটার মালিকানা একদল মানুষের ওপর থাকে এবং এটার লভ্যাংশ যাকে দিলে ভালো হয়, তাকে প্রদান করা হয়। ওয়াক্‌ফ নিয়ে কয়েকটি সহিহ হাদিস পাওয়া যায়। তার মধ্যে আবু তালহার হাদিস একটি।

বাগানটি ওয়াক্‌ফ করে আবু তালহা বাগানে যান। বাগানের ভেতর ছিলেন তাঁর স্ত্রী রুমাইসা ও আনাস ইবনে মালিক। আবু তালহা বাইরে থেকে চিৎকার দেন—

> *"তোমরা বাগান থেকে বেরিয়ে আসো। আমি আল্লাহর রাস্তায় এই বাগানটি দান করেছি।"*

রুমাইসা বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহা স্বামীর দানের কথা শুনে প্রশংসা করেন। তিনি সমাজের আর দশজন স্ত্রীর মতো জিজ্ঞেস করেননি—'এই বাগান কেন দান করলেন, অন্য বাগান দান করলে কী হতো!'

আবু তালহা ও রুমাইসা বিনতে মিলহানের আরেকটি ঘটনা থেকে সবরের শিক্ষা পাওয়া যায়।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কিন্তু আবু তালহার নিজের পুত্র ছিলেন না। তিনি ছিলেন আনাসের সৎ বাবা। তাঁদের নিজের পুত্রের ডাকনাম ছিল আবু উমাইর। আবু উমাইর ৪-৫ বছর বয়সী ছিলেন। তাঁর একটি পোষা পাখি ছিল। পাখিটির নাম নুগাইর। পাখিটি মারা গেলে তিনি মন

খারাপ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তাঁর নামের সাথে মিলিয়ে একটি ছড়া বলতেন—

> *"ইয়া আবা উমাইর! মা ফা'আলান নুগাইর?" অর্থাৎ, "ও আবু উমাইর! তোমার নুগাইরের কী হলো?"*[১৬]

শত শত মুহাদ্দিস এই হাদিসের ব্যাখ্যা লিখেন। এই হাদিস থেকে কী কী শিক্ষণীয় দিক আছে তারা তুলে ধরেন।

একবার আবু তালহার পুত্র আবু উমাইর সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেইসময় আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ব্যবসার জন্য বাইরে যেতে হবে। অসুস্থ ছেলেকে বাড়িতে রেখে তিনি কীভাবে বাইরে যাবেন? স্ত্রী তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, ছেলেকে নিয়ে চিন্তা না করতে; তিনি তাকে দেখাশোনা করবেন।

আবু তালহা অসুস্থ ছেলেকে বাড়িতে রেখে চলে গেলেন বাইরে। এদিকে রুমাইসা বিনতে মিলহান ছেলের যত্ন নিলেন। মায়ের যত্ন উপেক্ষা করে ছেলে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিলো। রুমাইসার কোলে পড়ে রইল ছেলের নিথর দেহ। ঘরে স্বামী নেই। এই অবস্থায় তিনি হা-হুতাশ না করে ঠান্ডা মাথায় সবকিছু সামনে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

সাধারণত মেয়েরা সহজে কারো মৃত্যুসংবাদ মেনে নিতে পারে না। তারা বেশি আবেগতাড়িত হয়। আর মেয়ে যদি মা হয় তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু, রুমাইসা বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহা আবেগাপ্লুত হবার পাশাপাশি বুদ্ধিমতার সাথে পরিস্থিতি সামাল দেবার পরিকল্পনা করেন।

মৃত ছেলেকে ঘরের এক কোণে রেখে দিলেন।

আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বাড়ি ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার ছেলে কেমন আছে? তার অসুখ কমেছে?"

দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে বাড়িতে ফেরা স্বামীকে আসা মাত্রই ছেলের মৃত্যুসংবাদ শুনালেন না। রুমাইসা বিনতে মিলহান পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তিনি বললেন, "যখন থেকে ও অসুস্থ,

---

১৬ সহিহ বুখারি: ৬১২৯, সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৬৯।

তখন থেকে যে কষ্ট পাচ্ছিল, তার চেয়ে এখন খুব শান্ত। আমি আশা করি সে আরাম লাভ করেছে।"

রুমাইসা বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহা বুঝালেন যে, অসুস্থ অবস্থায় ছেলে যে কষ্ট পাচ্ছিল, এখন সেই কষ্ট থেকে সে মুক্তি লাভ করেছে। মৃত্যুর পর তো সে আর অসুস্থতার কষ্ট পাচ্ছে না।

আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু আশ্বস্ত হলেন। সেই রাতে রুমাইসা বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজেকে স্বামীর জন্য প্রস্তুত করেন। তারা উভয়ে মিলিত হলেন।

রাতের শেষে রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহা স্বামীকে বললেন, "হে আবু তালহা! যদি কেউ কাউকে কোনো জিনিস ধার দেয় ব্যবহার করার জন্য, অতঃপর সেই জিনিসের মালিক যদি তা ফেরত নেয়, তবে ব্যবহারকারীর কি বাধা দেবার বা কিছু বলার আছে?"

আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "অবশ্যই না।"

অতঃপর আবু তালহাকে বললেন, "তাহলে শুনুন। আল্লাহ আপনাকে যে ছেলে ধার দিয়েছিলেন, তা ফেরত নিয়েছেন। অতএব আপনি ধৈর্য ধরে নেকির আশা করুন।"

আবু তালহা পূর্বের উদাহরণের সাথে একমত হলেও এবার তিনি রেগে যান। তাঁর কথা হলো—আমার ছেলে মারা গেল, তুমি আমাকে সেটা সরাসরি না বলে এভাবে বলবে কেন? সারারাত আমাকে জানাওনি কেন? ঘরে আমার মৃত ছেলে রেখে আমার সাথে এমন স্বাভাবিক ব্যবহার করলে কেন?

রুমাইসা বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহার অবস্থা তখন 'যার জন্য চুরি করলাম সে বলে চোর'!

আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু 'ইন্নালিল্লাহ...' পড়লেন। তিনি [illegible]লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে স্ত্রী কর্তৃক তার

[illegible]ত্যুসংবাদ গোপন করার কথা উল্লেখ করেন। সবকিছু শুনার [illegible]ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুদ্ধিমতী রুমাইসা বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তিরস্কার করলেন না। তিনি বরং

তাঁদের গতরাতের বরকতের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন। ফলে, রুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহা আবার গর্ভধারণ করেন।[১৭]

সেই রাতের মিলনের ফলে তাঁদের ঘরে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম আব্দুল্লাহ ইবনে আবি তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু। আব্দুল্লাহ ইবনে আবি তালহার ঘরে দশজন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন আলেম; বিশেষত কিরআতের আলেম।[১৮]

আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু জিহাদের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি জিহাদে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন। পরিবারের আপত্তি সত্ত্বেও মুসলিম বাহিনীর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন।

উম্মু সুলাইম বিনতে মিলহানের বোন উম্মু হারাম বিনতে মিলহান (আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর খালা) ছিলেন বিখ্যাত নারী সাহাবি। তাঁর একটি ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ।

উম্মু হারাম বিনতে মিলহানের স্বামী ছিলেন উবাদা ইবনে আস-সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু। মদিনায় হিজরতের সময় প্রায় দুই সপ্তাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুবায় অবস্থান করেন। সেই সময় তিনি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদের পাশেই ছিল উম্মু হারাম বিনতে মিলহানের বাড়ি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি শনিবার মাসজিদুল কুবাতে যেতেন। কখনো পায়ে হেঁটে যেতেন, কখনো বাহনে চড়ে।[১৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুবায় গেলে প্রায়ই উম্মু হারাম বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহার বাড়িতে বেড়াতে যেতেন এবং দুপুরে বিশ্রাম নিতেন।[২০]

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মু হারাম বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহার বাড়িতে বেড়াতে যান। উম্মু হারাম রাসূলুল্লাহকে খাবার খাওয়ান। খাবার খাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

১৭ সহিহ বুখারি: ১৩০১, সহিহ ইবনে হিব্বান: ৭২৫।

১৮ ইবনে আসীর, উসদুল গাবাহ মা'রিফাতিস সাহাবাহ: ৩/১৮০।

১৯ সহিহ বুখারি: ১১৯৩।

২০ ইবনে হাজার আসকালানী, আল-ইসাবাহ ফি তাময়িজিস সাহাবাহ: ৪/৪৪১।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্রাম নেন, উম্মু হারাম বিনতে মিলহান রাসূলের মাথার উকুন বাছতে থাকেন। এক সময় রাসূলুল্লাহ ঘুমিয়ে পড়েন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হঠাৎ হাসতে হাসতে ঘুম থেকে উঠেন। উম্মু হারাম বিনতে মিলহান বেশ অবাক হোন। তিনি জানতে চাইলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার হাসির কারণ কী?"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাসির কারণ জানালেন। তিনি স্বপ্ন দেখেন এবং বলেন—

> *"আমার উম্মতের কিছু লোককে যুদ্ধরত অবস্থায় আমার সামনে পেশ করা হলো। তারা এ সমুদ্রের মাঝে এমন অবস্থায় আরোহী, যেমন বাদশাহ তখতের ওপর।"*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই স্বপ্ন একটি ভবিষ্যদ্বাণী। মুসলিমদের তখন কোনো নৌবাহিনী ছিল না। এমনকি আবু বকর, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার খেলাফতকালেও মুসলিমদের নৌবাহিনী ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যা সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে বিস্ময়কর। অন্যদিকে, আরবরা সাধারণত নৌ-ভ্রমণে ভয় পেত। তারা বসবাস করত মরুভূমিতে, নৌ-ভ্রমণে তারা অভ্যস্ত ছিল না।

উম্মু হারাম বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে অনুরোধ করেন—

> *"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, আমাকে যেন সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করেন।"*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খালার জন্য দু'আ করেন। আবার তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। আবারও হাসতে হাসতে ঘুম থেকে উঠলেন। উম্মু হারাম বিনতে মিলহান হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে পূর্বের মতো বললেন এবং জানালেন যে—

> *"তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত হবে।"*[২১]

---

২১ সহিহ বুখারি: ২৭৮৮।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খালা উম্মু হারাম বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহাকে শাহাদাতের সুসংবাদ দেন। ফলে, উম্মু হারাম জীবিত থাকাবস্থায় 'শহীদা' (মহিলা শহীদ) উপাধি লাভ করেন। কেউ কেউ তাঁকে এই নামে ডাকত।[২২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেন। আবু বকর, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ইন্তেকাল করেন। উম্মু হারাম বিনতে মিলহান আশায় বসে আছেন, কবে সেই সুবর্ণ সুযোগ আসবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায় ২০-২৫ বছর পরের ঘটনা। উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নৌ-অভিযানের প্রস্তাব দেন। এর আগে অনেকবার নৌ-অভিযানের প্রস্তাব আসলেও ক্ষতির আশঙ্কায় সেটা কার্যকর হয়নি। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও এই আশঙ্কায় অনুমতি দেননি। তবে এবার উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অনুমতি দেন।

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অভিযান চালান বর্তমান ইউরোপের সাইপ্রাসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবি সেই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উবাইদা ইবনে আস-সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু; উম্মু হারাম বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহার স্বামী।

মুসলিম বাহিনীর প্রথম নৌ-অভিযানে স্বামীর সাথে উম্মু হারাম বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহাও অংশগ্রহণ করেন। মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ ছাড়াই সাইপ্রাস জয় করে। বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমন একদিন উম্মু হারাম বিনতে মিলহান তাঁর ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং ঘাড়ে আঘাত পান। সেই জখমের ফলে তিনি ইন্তেকাল করেন।[২৩]

---

২২ ডক্টর আব্দুল মাবুদ, আসহাবে রাসুলের জীবনকথা: ৬/১৫১।

২৩ সহিহ বুখারি: ২৭৮৮, ৭০০২।

তিনি যেখানে ইন্তেকাল করেন, সেখানে একটি মসজিদ স্থাপন করা হয়। একসময় মুসলিমরা সাইপ্রাস শাসন করত। প্রায় আড়াইশো বছর সাইপ্রাস ছিল মুসলিম শাসনের অন্তর্ভুক্ত। সাইপ্রাস, মাল্টা এবং আন্দালুস; এই তিনটি ভূমির শাসনক্ষমতা একসময় মুসলিমদের ছিল, পরবর্তীতে ভূমিগুলো মুসলিমদের হাতছাড়া হয়!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মা উম্মু সুলাইম বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহার বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নিতেন; তখন তিনি বাড়িতে থাকতেন না। বাড়ি ফিরে উম্মু সুলাইম দেখতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘামছেন। তিনি একটি কৌটা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘাম সংগ্রহ করতেন।

ঘুম থেকে উঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করতেন, "হে উম্মু সুলাইম! তুমি এসব কী করছো?"

উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা জবাব দিতেন — "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের শিশুদের জন্য তার বরকত নিচ্ছি।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, "ভালো করছো।"[২৪]

আরেকটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, উম্মু সুলাইম বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেন,

> *"এ হচ্ছে আপনার ঘাম, যা আমরা সুগন্ধির সাথে মেশাই।*
> *আর এ তো সব সুগন্ধির চেয়ে সেরা সুগন্ধি।"*[২৫]

দুনিয়ার বুকে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত বেশিরভাগ সাহাবি পুরুষ। নারীদের মধ্যে যে কয়েকজন আছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও উম্মু সুলাইম বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহা।

---

২৪ সহিহ বুখারি: ৫৯৫০।

২৫ সহিহ বুখারি: ৬২৮১, সহিহ মুসলিম: ৫৯৪৯।

প্রত্যেকেই সহিহ বুখারির হাদিসটি জানেন। কিন্তু, বেশিরভাগই হাদিসের শেষাংশ জানেন না, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রাতে জান্নাতে গিয়ে এক মহিলার পদচারণা শুনতে পান। তিনি জানতে চাইলেন, এটি কার পদচারণা? তাঁকে বলা হলো, এটা আবু তালহার স্ত্রী রুমাইসা বিনতে মিলহানের।[২৬]

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারে আরেকজন বিখ্যাত সাহাবি ছিলেন। তাঁর নাম আনাস ইবনে নদর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

ইসলামের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ যুদ্ধ বদর যুদ্ধে কোনো এক কারণে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারার আফসোস যেন তাঁর শেষ হচ্ছে না। তিনি মনে মনে সংকল্প করলেন, "আল্লাহ যদি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোনো যুদ্ধে শরিক করেন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ দেখবেন যে, আমি কত প্রাণপণে লড়াই করি।"

উহুদ যুদ্ধের ঘোষণা এলো। আনাস ইবনে নদর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিশ্রুতি প্রমাণের পালা। তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের ময়দানে তাঁর সাথে সা'দ ইবনে মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহুর দেখা হয়। তিনি সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, "আমি উহুদের অপর প্রান্তে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি।"

যুদ্ধের ময়দানে এক পর্যায়ে গুজব রটে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়েছেন। আনাস ইবনে নদর রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখতে পেলেন অনেক বড় বড় সাহাবি হাত গুটিয়ে বসে আছেন। তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন, "কী হয়েছে?" তারা জবাব দেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো ইন্তেকাল করেছেন।"

এটা শুনে আনাস ইবনে নদর রাদিয়াল্লাহু আনহু মনোবল না হারিয়ে বরং বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি

---

২৬ সহিহ বুখারি: ৩৬৭৯।

ইন্তেকাল করেন, তাহলে আমরা বেঁচে থেকে কী করব? আসুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পথে জীবন দিয়েছেন, আমরাও সে পথে জীবন দিই।"

আনাস ইবনে নদর রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর শরীরে অনেকগুলো তীরের আঘাত লাগে, তরবারির আঘাত লাগে। এক পর্যায়ে তিনি ঢলে পড়লেন। আল্লাহর সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করে শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর শরীরে ৭০-৮০টি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। চেহারা দেখে তাঁকে চেনার সুযোগ ছিল না।

শেষপর্যন্ত তাঁর বোন রুবাইয়্যা বিনতে নদর রাদিয়াল্লাহু আনহা ভাইয়ের আঙ্গুল দেখে তাঁকে সনাক্ত করেন।[২৭]

উহুদ যুদ্ধের পর আল্লাহ কুরআনের একটি আয়াত নাজিল করে আনাস ইবনে নদর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাহসিকতা এবং তাঁর কৃত অঙ্গীকারের কথা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করে বলেন:

> *"মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সত্যে বাস্তবায়ন করেছে। তাদের কেউ কেউ (যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করে) তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে। আবার কেউ কেউ (শাহাদাতবরণের) প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা (প্রতিশ্রুতিতে) কোনো পরিবর্তন করেনি।" [সূরা আল-আহযাব ৩৩: ২৩]*

যার মা এমন, যার সৎ বাবা এমন, যার খালা এমন, যার চাচার শানে কুরআনের আয়াত নাজিল হয়, তিনি কেমন হবেন সেটা ধারণা করাই যায়। সাধারণত মা-বাবা নেককার হলে সন্তানও নেককার হয়। পরিবারের প্রভাব আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর পড়ে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনায় যান, তখন আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। সেই সময় মদিনার সাহাবিগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী নিয়ে যায়। উম্মু সুলাইম

---

২৭ সহিহ বুখারি: ৪০৪৮।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খালা উম্মু হারাম বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহাকে শাহাদাতের সুসংবাদ দেন। ফলে, উম্মু হারাম জীবিত থাকাবস্থায় 'শহীদা' (মহিলা শহীদ) উপাধি লাভ করেন। কেউ কেউ তাঁকে এই নামে ডাকত।[২২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেন। আবু বকর, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ইন্তেকাল করেন। উম্মু হারাম বিনতে মিলহান আশায় বসে আছেন, কবে সেই সুবর্ণ সুযোগ আসবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায় ২০-২৫ বছর পরের ঘটনা। উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নৌ-অভিযানের প্রস্তাব দেন। এর আগে অনেকবার নৌ-অভিযানের প্রস্তাব আসলেও ক্ষতির আশঙ্কায় সেটা কার্যকর হয়নি। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও এই আশঙ্কায় অনুমতি দেননি। তবে এবার উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অনুমতি দেন।

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অভিযান চালান বর্তমান ইউরোপের সাইপ্রাসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবি সেই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উবাইদা ইবনে আস-সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু; উম্মু হারাম বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহার স্বামী।

মুসলিম বাহিনীর প্রথম নৌ-অভিযানে স্বামীর সাথে উম্মু হারাম বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহাও অংশগ্রহণ করেন। মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ ছাড়াই সাইপ্রাস জয় করে। বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমন একদিন উম্মু হারাম বিনতে মিলহান তাঁর ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং ঘাড়ে আঘাত পান। সেই জখমের ফলে তিনি ইন্তেকাল করেন।[২৩]

---

২২ ডক্টর আব্দুল মাবুদ, আসহাবে রাসুলের জীবনকথা: ৬/১৫১।

২৩ সহিহ বুখারি: ২৭৮৮, ৭০০২।

তিনি যেখানে ইন্তেকাল করেন, সেখানে একটি মসজিদ স্থাপন করা হয়। একসময় মুসলিমরা সাইপ্রাস শাসন করত। প্রায় আড়াইশো বছর সাইপ্রাস ছিল মুসলিম শাসনের অন্তর্ভুক্ত। সাইপ্রাস, মাল্টা এবং আন্দালুস; এই তিনটি ভূমির শাসনক্ষমতা একসময় মুসলিমদের ছিল, পরবর্তীতে ভূমিগুলো মুসলিমদের হাতছাড়া হয়!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মা উম্মু সুলাইম বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহার বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নিতেন; তখন তিনি বাড়িতে থাকতেন না। বাড়ি ফিরে উম্মু সুলাইম দেখতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘামছেন। তিনি একটি কৌটা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘাম সংগ্রহ করতেন।

ঘুম থেকে উঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করতেন, "হে উম্মু সুলাইম! তুমি এসব কী করছো?"

উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা জবাব দিতেন — "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের শিশুদের জন্য তার বরকত নিচ্ছি।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, "ভালো করছো।"[২৪]

আরেকটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, উম্মু সুলাইম বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেন,

> *"এ হচ্ছে আপনার ঘাম, যা আমরা সুগন্ধির সাথে মেশাই।*
> *আর এ তো সব সুগন্ধির চেয়ে সেরা সুগন্ধি।"*[২৫]

দুনিয়ার বুকে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত বেশিরভাগ সাহাবি পুরুষ। নারীদের মধ্যে যে কয়েকজন আছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও উম্মু সুলাইম বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহা।

---

২৪ সহিহ বুখারি: ৫৯৫০।

২৫ সহিহ বুখারি: ৬২৮১, সহিহ মুসলিম: ৫৯৪৯।

প্রত্যেকেই সহিহ বুখারির হাদিসটি জানেন। কিন্তু, বেশিরভাগই হাদিসের শেষাংশ জানেন না, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রাতে জান্নাতে গিয়ে এক মহিলার পদচারণা শুনতে পান। তিনি জানতে চাইলেন, এটি কার পদচারণা? তাঁকে বলা হলো, এটা আবু তালহার স্ত্রী রুমাইসা বিনতে মিলহানের।[২৬]

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারে আরেকজন বিখ্যাত সাহাবি ছিলেন। তাঁর নাম আনাস ইবনে নদর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

ইসলামের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ যুদ্ধ বদর যুদ্ধে কোনো এক কারণে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারার আফসোস যেন তাঁর শেষ হচ্ছে না। তিনি মনে মনে সংকল্প করলেন, "আল্লাহ যদি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোনো যুদ্ধে শরিক করেন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ দেখবেন যে, আমি কত প্রাণপণে লড়াই করি।"

উহুদ যুদ্ধের ঘোষণা এলো। আনাস ইবনে নদর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিশ্রুতি প্রমাণের পালা। তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের ময়দানে তাঁর সাথে সা'দ ইবনে মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহুর দেখা হয়। তিনি সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, "আমি উহুদের অপর প্রান্তে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি।"

যুদ্ধের ময়দানে এক পর্যায়ে গুজব রটে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়েছেন। আনাস ইবনে নদর রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখতে পেলেন অনেক বড় বড় সাহাবি হাত গুটিয়ে বসে আছেন। তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন, "কী হয়েছে?" তারা জবাব দেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো ইন্তেকাল করেছেন।"

এটা শুনে আনাস ইবনে নদর রাদিয়াল্লাহু আনহু মনোবল না হারিয়ে বরং বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি

---

২৬ সহিহ বুখারি: ৩৬৭৯।

ইন্তেকাল করেন, তাহলে আমরা বেঁচে থেকে কী করব? আসুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পথে জীবন দিয়েছেন, আমরাও সে পথে জীবন দিই।"

আনাস ইবনে নদর রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর শরীরে অনেকগুলো তীরের আঘাত লাগে, তরবারির আঘাত লাগে। এক পর্যায়ে তিনি ঢলে পড়লেন। আল্লাহর সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করে শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর শরীরে ৭০-৮০টি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। চেহারা দেখে তাঁকে চেনার সুযোগ ছিল না।

শেষপর্যন্ত তাঁর বোন রুবাইয়্যা বিনতে নদর রাদিয়াল্লাহু আনহা ভাইয়ের আঙ্গুল দেখে তাঁকে সনাক্ত করেন।[২৭]

উহুদ যুদ্ধের পর আল্লাহ কুরআনের একটি আয়াত নাজিল করে আনাস ইবনে নদর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাহসিকতা এবং তাঁর কৃত অঙ্গীকারের কথা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করে বলেন:

> *"মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সত্যে বাস্তবায়ন করেছে। তাদের কেউ কেউ (যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করে) তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে। আবার কেউ কেউ (শাহাদাতবরণের) প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা (প্রতিশ্রুতিতে) কোনো পরিবর্তন করেনি।" [সূরা আল-আহযাব ৩৩: ২৩]*

যার মা এমন, যার সৎ বাবা এমন, যার খালা এমন, যার চাচার শানে কুরআনের আয়াত নাজিল হয়, তিনি কেমন হবেন সেটা ধারণা করাই যায়। সাধারণত মা-বাবা নেককার হলে সন্তানও নেককার হয়। পরিবারের প্রভাব আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর পড়ে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনায় যান, তখন আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। সেই সময় মদিনার সাহাবিগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী নিয়ে যায়। উম্মু সুলাইম

---

২৭ সহিহ বুখারি: ৪০৪৮।

বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, তাঁর একমাত্র পুত্রকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে যান।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনসারদের প্রত্যেক নারী-পুরুষ আপনাকে কিছু না কিছু উপহার দিয়েছেন। আমি তো আপনাকে তেমন কিছু দিতে পারছি না। আমার এই ছেলেটি আছে, সে লিখতে জানে; এখনো বালেগ হয়নি। আপনি তাকে গ্রহণ করুন, সে আপনার খেদমত করবে।"[২৮]

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় তাঁর নাম বলেন 'উনাইস'। আনাস না বলে উনাইস বলেন কেন?

এটাকে আরবি ব্যাকরণের ভাষায় 'তাসগীর' বলা হয়। এর দ্বারা কোনো বিশেষ্যকে ক্ষুদ্রার্থে উপস্থাপন করা হয়। যেমন: পাহাড়ের আরবি 'জাবাল'; এটাকে ক্ষুদ্রার্থে উপস্থাপন করা হয় 'জুবাইল'। আনাসকে যখন ক্ষুদ্রার্থে উপস্থাপন করা হয়, তখন বলতে হয় 'উনাইস'। 'আব্দুল্লাহ' মানে আল্লাহর ইবাদতকারী। এটাকে ক্ষুদ্রার্থে উপস্থাপন করা হয় 'উবাইদুল্লাহ' বলে। এটার পেছনে যুক্তি হলো, আল্লাহকে যেভাবে ইবাদত করা উচিত, সেভাবে ইবাদত করা তো সম্ভব না; এজন্য আল্লাহর ক্ষুদ্র ইবাদতকারী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে উবাইদুল্লাহ নামটি কেউ কেউ বেছে নেন।

সেদিন থেকে আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করা শুরু করেন। তিনি হন রাসূলুল্লাহর স্বেচ্ছাসেবী খাদেম; তিনি দাস ছিলেন না। নিজেকে পুরোদমে রাসূলুল্লাহর খেদমতে সঁপে দেন। এভাবে তিনি দশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক খাদেম ছিলেন। যেমন: বিলাল ইবনে রাবাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ

---

২৮ ডক্টর আব্দুল মা'বুদ, আসহাবে রাসুলের জীবনকথা: ৩/১৮৩।

রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। কিন্তু, যখনই 'খাদিমু রাসূলিল্লাহ' বলা হয়, তখন শুধুমাত্র আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বুঝায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনাস ইবনে মালিককে অনেকটা পরিবারের সদস্যের মতো বিবেচনা করতেন। তাঁকে অনেক বিষয়ে উপদেশ দিতেন, অনেককিছু শেখাতেন। ফলে, তিনি হাদিস বর্ণনাকারীর দ্বিতীয়/তৃতীয় অবস্থান অর্জন করেন।

একবার উম্মু সুলাইম বিনতে মিলহান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুরোধ করেন, রাসূলুল্লাহ যেন তাঁর পুত্রের জন্য দু'আ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য দু'আ করেন—

> *"হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে সম্পদ ও সন্তান দান করুন এবং তাতে বরকত দান করুন।"*[২৯]

আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য দু'আ করেন, "হে আল্লাহ! আপনার তাঁর সম্পদ বৃদ্ধি করুন, তাঁর সন্তান বৃদ্ধি করুন এবং তাঁকে জান্নাত দান করুন।"[৩০]

এই দু'আয় আর কী বাকি থাকল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য দুনিয়ার কল্যাণ চাইলেন, আখিরাতের কল্যাণও চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুনিয়াবি কল্যাণের দু'আ আনাস ইবনে মালিক দেখতে পান। তিনি অনেক সম্পদশালী হন, অনেক সন্তানের পিতা হন এবং দীর্ঘজীবন লাভ করেন। বাকি থাকল শুধু জান্নাত লাভ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আর ব্যাপারে তিনি বলতেন—

> *"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার জন্য তিনটি দু'আ করেন। অবশ্য এর দুটো আমি দুনিয়াতে লাভ করেছি এবং তৃতীয়টি আখিরাতে পাবার আশা রাখি।"*[৩১]

---

২৯ সহিহ বুখারি: ১৯৮২।

৩০ ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৯/১৫২।

৩১ জামে' তিরমিজি: ৩৮২৭।

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু শেষ বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আর বরকতের কথা উল্লেখ করে বলেন, "আজ আনসারদের মধ্যে আমার চেয়ে বেশি সম্পদশালী আর কেউ নেই।"

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর চারটি বাড়ি ছিল।

- একটি বসরার জামে মসজিদের সামনে
- একটি ইসতাফানুস গলিতে
- একটি বসরা থেকে দুই ফারসাখ দূরে
- তাছাড়া আরেকটি বাড়ি ছিল তাঁর।[৩২]

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সৌখিন এবং পরিচ্ছন্ন প্রকৃতির রুচিবান ব্যক্তি। তাঁর জীবন ছিল জাঁকজমকপূর্ণ। তিনি যত্ন সহকারে একটি বাগান তৈরি করেছিলেন যেখানে বছরে দুই বার ফল আসত। সেই বাগানে একটি ফুল ছিল যা মিশকের মতো সুগন্ধি ছড়ায়।[৩৩]

---

৩২ তারীখে ইবনে আসাকির: ৩/১৪১।

৩৩ ইবনে হাজার আসকালানী, আল-ইসাবাহ ফি তামযিজিস সাহাবাহ: ১/৭১।

সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু

"তাকওয়ার অধিকারী লোকদের ধন-সম্পদের মালিক হওয়াতে কোনো দোষ নেই।"

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন মদিনার খাযরাজ গোত্রের নেতা। তাঁর পরিবার দানশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিল। মানুষকে আপ্যায়ন করা ছিল এই পরিবারের শত বছরের ঐতিহ্য।

তাঁর দাদা দুলাইম ছিলেন মুশরিক, দেবী মানতের পূজা করতেন। এই দেবীর মূর্তি ছিল মক্কার পাশে মুসাল্লাল নামক স্থানে। দুলাইম সেখানে প্রতি বছর ১০টি উট বলি দিতেন। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে উবাদা ইবনে দুলাইম এই কাজ অব্যাহত রাখেন। সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত দাদার ঐতিহ্য মেনে চলেন। ইসলাম গ্রহণের পর সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর ছেলে পূর্বপুরুষদের ধারা বজায় রাখেন; তবে নিয়ত পরিবর্তন করেন। তারা কা'বার চত্বরে উটগুলো কুরবানি করতেন শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য।[১]

সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে কায়স ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু পিতৃ-পুরুষের ঐতিহ্য অব্যাহত রাখলে কয়েকজন তাঁকে এটা থেকে বিরত থাকতে বলেন। কিন্তু, তিনি তাদের কথায় কর্ণপাত করেননি। ফলে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে

---

১ ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, আসহাবে রাসূলের জীবনকথা: ৩/১০৩।

অভিযোগ করেন। অভিযোগ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কায়স তো দানশীল পরিবারের সন্তান।"[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদিনায় আবু আইয়ূব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে থাকেন। সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিদিন বড় এক গামলা গোশত, দুধের সারীদ অথবা সিরকা ও তেল পাঠাতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য।[৩]

একবার সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু ৪০টি উট জবাই করেন। ৪০টি উট জবাই করেন মদিনার মানুষজনকে খাওয়াবেন বলে। জবাইকৃত উট থেকে বেছে বেছে উটের মগজ রান্না করে এক প্লেট রাসূলের জন্য নিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "এগুলো কী?"

তিনি বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ইচ্ছে হলো আপনাকে একটু পেট ভরে মগজ খাওয়াই।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবির কথা রাখলেন এবং তাঁর কল্যাণ কামনা করে দু'আ করেন।[৪]

সাহাবিদের মধ্যে কেউ কেউ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন। সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।

তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করেন—

> *"হে আল্লাহ! আমাকে সম্মান এবং মর্যাদা দান করুন। সম্মানের জন্য কর্মের প্রয়োজন, কর্মের জন্য প্রয়োজন সম্পদ। হে আল্লাহ! সামান্য সম্পদে আমার জন্য যথেষ্ট নয় (আমাকে অনেক সম্পদ দান করুন)।"*[৫]

---

২ ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, আসহাবে রাসূলের জীবনকথা: ৩/১০৩।

৩ ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, আল-ইসাবাহ ফি তাময়িজিস সাহাবাহ: ২/৩০।

৪ আল্লামা ইউসুফ কান্ধলভী, হায়াতুস সাহাবা: ২/১৮৯।

৫ মুস্তাদরাকে হাকিম: ৩/২৫৩।

সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহুর এমন দু'আর কারণ হলো, তিনি চাইতেন মানুষের উপকার করতে। সম্পদ উপার্জনের পেছনে তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল মানবকল্যাণমুখী। মদিনায় কোনো আগন্তুক গেলে তাকে খাবারের চিন্তা করতে হতো না। সেই সময় কোনো হোটেল ছিল না। সা'দ ইবনে উবাদা আগন্তুকদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতেন।

সাহাবিদের একটি অংশ মসজিদে থাকতেন। তারা 'আসহাবে সুফফা' নামে পরিচিত ছিলেন। সচ্ছল সাহাবিরা তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতেন। কেউ একজন, দুজন করে আসহাবে সুফফার সাহাবিদের তাদের বাড়িতে নিয়ে যেতেন। সেখানে সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একাই প্রতিদিন আসহাবে সুফফার ৮০ জনের খাবারের ব্যবস্থা করতেন।[৬]

তাঁর বাড়ি ছিল মদিনার বাজারের পাশে। তাঁদের দুর্গের ওপর দাঁড়িয়ে প্রায়ই একজন ঘোষক ঘোষণা করতেন—"যারা মাংস, চর্বি এবং ভালো খাবার খেতে চায়, তারা যেন আমাদের অতিথি হয়ে যায়।"

এই বাড়িতে এমন রীতি চার প্রজন্ম ধরে চলে। দুলাইম, উবাদা ইবনে দুলাইম, সা'দ ইবনে উবাদা, কায়স ইবনে সা'দ —মোট চার পুরুষ এই ধারা অব্যাহত রাখেন। সাহাবি, তাবেয়িগণ পর্যন্ত এটা দেখতে পান।[৭]

একটি অভিযানের সময় সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু ১০টি উট বোঝাই খেজুর পাঠান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। তাঁর ছেলে কায়স ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু সেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ এই পরিবারের জন্য দু'আ করেন—

> *"হে আল্লাহ! সা'দ ও তাঁর পরিবারের ওপর রহম করুন। সা'দ ইবনে উবাদা কতই না ভালো মানুষ!"*[৮]

---

৬ ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, আল-ইসাবাহ ফি তাময়িজিস সাহাবাহ: ২/৩০।

৭ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/৬১৩।

৮ তারীখে ইবনে আসাকির: ৬/৮৮।

সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মা যখন ইন্তেকাল করেন, তিনি তখন মায়ের কাছে উপস্থিত ছিলেন না। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে ইন্তেকাল করেন। এখন যদি আমি তার পক্ষে কিছু সাদকা করি, তাহলে কি সেটা তার উপকারে আসবে?"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, আসবে।"

অতঃপর সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু মিখরাফ নামক বাগানটি মায়ের পক্ষে সাদকা করেন।[৯]

সেই যুগে একটি বাগানের অর্থমূল্য ছিল কয়েক কোটি টাকার মতো। সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু মায়ের ঈসালে সওয়াবের জন্য কেবলমাত্র বাগান দান করেননি, তিনি মদিনার মসজিদে তাঁর মায়ের পক্ষে পানি পানের ব্যবস্থা করেন; যা 'সিকায়া আলে সা'দ' নামে পরিচিত ছিল।[১০]

---

৯ সহিহ বুখারি: ২৭৫৬।

১০ সুনানে নাসাঈ: ৩৬৬৬।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু

"দুনিয়া বিমুখতা মানে তুমি কিছুর মালিক হবে না, তা নয়।
বরং এর মানে হলো—কোনো কিছু যেন তোমার 'মনিব'
না হয়।"

-আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক হাদিস বর্ণনাকারী। তিনি মদিনার অধিবাসী ছিলেন না, তিনি ছিলেন দাওস গোত্রের অধিবাসী।

তিনি যখন মদিনায় হিজরত করেন, তখন দরিদ্র ছিলেন। তাঁর হাতে কোনো অর্থকড়ি ছিল না, থাকার জন্য বাসস্থান ছিল না। তিনি মসজিদে বসবাস করেন, যাদেরকে বলা হতো 'আহলুস সুফফা'। তিনি ছিলেন আহলুস সুফফার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত এবং আহলুস সুফফার নেতৃপর্যায়ের সাহাবি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি কখনো আহলুস সুফফার সাথে যোগাযোগ করতেন, তখন আবু হুরাইরার মাধ্যমে যোগাযোগ করতেন।

আহলুস সুফফার অধিবাসীরা মসজিদের বারান্দায় বসবাস করতেন। তারা যেখানে বসবাস করতেন, সেখানে ছাদ নির্মাণ করা হতো। তাদেরকে 'ইসলামের অতিথি' বলা হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার অন্যান্য সাহাবিদেরকে উৎসাহ দেন, তারা যেন নিজেদের খাবার আহলুস সুফফাদের সাথে ভাগ করে খায়। দুজনের খাবার তিনজন খাওয়া যায়, তিনজনের খাবার চারজন খাওয়া

যায় সংক্রান্ত যত হাদিস আছে, তা মূলত আহলুস সুফফাদের প্রেক্ষাপটে।

মদিনায় শস্য হলে (যেমন: খেজুর) সেটা মসজিদের ছাদে ঝুলিয়ে রাখা হতো। আহলুস সুফফার অধিবাসীরা সেই খেজুর খেতেন।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আল্লাহর কসম! যিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। আমি ক্ষুধার তাড়নায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম। আর কখনো পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। একদিন আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিগণের রাস্তায় বসে থাকলাম। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যাচ্ছিলেন। আমি কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করলাম। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি আমাকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াবেন। কিন্তু, তিনি কিছু করলেন না।

অতঃপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি আমাকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াবেন। কিন্তু, তিনি কিছু করলেন না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে দেখেই মুচকি হাসলেন এবং আমার প্রাণের ও মুখের চেহারার অবস্থা কী তা আঁচ করতে পারলেন।

তিনি বললেন, 'হে আবু হির!'

আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হাজির'।

তিনি বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে চলো'। এই বলে তিনি চলতে লাগলেন আর আমি তাঁর অনুসরণ করলাম।

তিনি ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং আমাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তারপর তিনি ঘরে প্রবেশ করে একটি পেয়ালায় কিছু দুধ পেলেন। তিনি বললেন: 'এ দুধ কোথেকে এসেছে?'

তাঁরা বললেন, এটা আপনাকে অমুক পুরুষ বা অমুক মহিলা হাদিয়া দিয়েছেন। তিনি বললেন: 'হে আবু হির! আমি বললাম, আমি

হাজির হে আল্লাহর রাসূল! তুমি সুফফাবাসীদের কাছে যাও এবং তাদেরকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো'।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'এই আদেশ শুনে আমি নিরাশ হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম যে, এ সামান্য দুধ দ্বারা সুফফাবাসীদের কী হবে? এ সামান্য দুধ আমার জন্যই যথেষ্ট হতো। এটা পান করে আমার শরীরে শক্তি আসত'।

যখন তাঁরা এসে গেলেন, তখন তিনি আমাকে আদেশ দিলেন, আমি যেন তা তাঁদেরকেই দেই। আর আমার আশা রইল না যে, এ দুধ থেকে আমি কিছু পাব। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ না মেনে কোনো উপায় নেই। তাই তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। তাঁরা এসে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তাঁরা এসে ঘরে আসন গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন: 'হে আবু হির!' আমি বললাম, 'আমি হাজির হে আল্লাহর রাসূল!'

তিনি বললেন, 'তুমি পেয়ালাটি নাও আর তাদেরকে দাও'। আমি পেয়ালা নিয়ে একজনকে দিলাম। তিনি তা তৃপ্ত হয়ে পান করে পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। আমি আরেকজনকে পেয়ালাটি দিলাম। তিনিও তৃপ্ত হয়ে পান করে পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। এমন কি আমি এভাবে দিতে দিতে শেষতক নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছলাম। তাঁরা সবাই তৃপ্ত হলেন।

তারপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়ালাটি নিজ হাতে নিয়ে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। আর বললেন: 'হে আবু হির'! আমি বললাম, 'আমি হাজির, হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি বললেন: 'এখন তো আমি আছি আর তুমি আছো'। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ঠিক বলছেন'।

তিনি বললেন, 'এখন তুমি বসো এবং পান করো'। তখন আমি করলাম। তিনি বললেন, তুমি আরও পান করো। আমি ান করলাম। তিনি আমাকে পান করার নির্দেশ দিতেই থাকলেন। এমন কি আমি বললাম যে, আর না। যে সত্তা আপনাকে

সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম। আমার পেটে আর জায়গা পাচ্ছি না। তিনি বললেন, তাহলে আমাকে দাও। আমি পেয়ালাটি তাঁকে দিলাম। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন ও বিসমিল্লাহ্ বলে বাকি পান করলেন।[১]

একসময় আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুরও আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। নিঃস্ব থেকে তিনিও স্বাবলম্বী হন।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হবার পর আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বাহরাইনের গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। বাইরাইন থেকে ফেরার সময় আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ১০,০০০ দিরহাম নিয়ে মদিনায় আসেন। উমর ইবনুল খাত্তাব তাঁর কাছে এত টাকা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এত সম্পদ কোথায় পেলে?"

আমাদের সময়ের রাজনীতিবিদরা রাজনীতি করে উপার্জন করে, কোটিপতি হয়। এতে কেউ কিছু মনে করে না। তাদেরকে জবাবদিহি করতে হয় না। অথচ উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন দেখতে পেলেন আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে অস্বাভাবিক সম্পদ, তখন তিনি তাঁকে জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, বাহরাইন থাকাবস্থায় তিনি ব্যবসা করে এই টাকা উপার্জন করেছেন, এগুলো ঘুষ বা দুর্নীতির টাকা নয়।

উমর ইবনুল খাত্তাব বিষয়টি যাচাই করার জন্য বাহরাইনে লোক পাঠান। দেখা গেল, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সত্য বলছেন।[২]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো নিঃস্ব অনেক সাহাবি জীবনের শেষদিকে সম্পদশালী হয়েছেন। তারা তাদের সম্পদ জনকল্যাণে ব্যয় করেন। যেমন— খাব্বাব ইবনুল আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু।

---

১ সহিহ বুখারি: ৬৪৫২।

২ আল্লামা ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/২২২।

খাব্বাব ইবনুল আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন কামার। তিনি তরবারি বানাতেন। মক্কায় এসেছিলেন দাস হয়ে। উম্মু আনমার নামের এক মহিলার দাস তিনি। মক্কার সমাজের নিম্নশ্রেণির একজন হিসেবে ইসলাম গ্রহণের ফলে তাঁর ওপর অমানবিক নির্যাতন করা হয়।

তাঁকে রোদের মধ্যে শুইয়ে পিঠে গরম পাথর দেওয়া হতো। ফলে তাঁর পিঠ ঝলসে মাংস পোড়ার গন্ধ বের হতো। কাফিররা সেগুলো দেখে উচ্ছ্বসিত হতো!

তাঁর অর্থনৈতিক জীবনেও বিপর্যয় নামে। মানুষ তাঁকে দিয়ে তরবারি বানাত, কিন্তু তিনি টাকা চাইলে টাকা দিত না। সেসব কাফিররা বলত, "তুমি না আখিরাতে বিশ্বাস করো? মৃত্যুর পর বিচার হবে এমন বিশ্বাস করো? আমরা তোমাকে আখিরাতে টাকা দিয়ে দেব!"

নিজের দুঃখের কথা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতেন। আল্লাহ এই প্রসঙ্গে কুরআনের একটি আয়াত নাজিল করেন।[৩]

খাব্বাব ইবনুল আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই কঠিন সময় ধৈর্যধারণ করেন। বদর, উহুদ, খন্দক এসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইসলামের দুর্বল অবস্থা থেকে শক্তিশালী অবস্থা দুটোই প্রত্যক্ষ করেন। সাহাবিরা অর্থের অভাবে, খাদ্যের অভাবে খেতে পারেনি এই সময়গুলোর তিনি নিজে যেমন ছিলেন একজন সাক্ষী, তেমনি সাহাবিদের সামনে অফুরন্ত ধনভাণ্ডার যখন আসে সেই সময়গুলোও তিনি দেখতে পান।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যিনি ছিলেন একজন দাস, যার কাছ থেকে বাকিতে কাজ আদায় করে কাফিররা টাকা পরিশোধ করত না, যিনি ছিলেন প্রায় নিঃস্ব, তাঁর জীবনের শেষদিকে তিনি হন কোটিপতি!

---

৩ সহিহ বুখারি: ২০৯১।

প্রথমদিকের ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে তিনি অনেক ভাতা পেতেন। বার্ষিক ভাতা ছিল প্রায় কোটি টাকা। তাছাড়া গনিমতের সম্পদ পেতেন। এসব মিলিয়ে তাঁর কাছে জমা হয় প্রায় ৮০,০০০ দিরহাম। সাহাবিদের সময় আশি হাজার দিরহাম দিয়ে যা কেনা যেত, আমাদের সময় সেই অর্থ প্রায় ১৩ কোটি টাকা।

খাব্বাব ইবনুল আরাত সেই অর্থ নিজের জন্য জমা রাখেননি। তিনি একটি জায়গায় তাঁর ১৩ কোটি টাকা রাখেন। জায়গাটি সবাই চিনত। তিনি ঘোষণা দেন—

> *"যার যখন প্রয়োজন হবে, সে যেন তার প্রয়োজনমতো এখান থেকে অর্থ নেয়। এই অর্থ কখনো ফিরত দেওয়া লাগবে না। এগুলো আপনাদেরই।"*

যার খাবার কেনার টাকা থাকত না, সে খাব্বাব ইবনুল আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেই উন্মুক্ত জায়গা থেকে টাকা নিত, যার ঋণ পরিশোধের প্রয়োজন হতো, সে খাব্বাব ইবনুল আরাতের সেই জায়গা থেকে ইচ্ছেমতো টাকা নিতে পারত।

এ যেন উন্মুক্ত ব্যাংক! যেখান থেকে লোন নিতে দরখাস্ত করতে হয় না, জমি-জমা বন্ধক রাখতে হয় না, সুদ দিতে হয় না; উপরন্তু, সেই ঋণ পরিশোধই করতে হয় না!

যে সাহাবি একসময় নিঃস্ব ছিলেন, তিনি বাকি মানুষের জন্য এমন একটি ব্যবস্থা করে যান, যা থেকে সমাজের গরিব, নিঃস্ব, অভাবীরা উপকৃত হতে পারে।

একবার তিনি তাঁর দুর্দশার কাহিনি অন্যান্য সাহাবিদেরকে বলেন। সাহাবিরা বলেন, "খাব্বাব! সুসংবাদ গ্রহণ করো। আগামীকাল তুমি প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথিদের সাথে মিলিত হবে।"

ইসলামের জন্য এত ত্যাগ করা সত্ত্বেও খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ভয় পেতেন; যা একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য। তিনি বলতেন,

"আল্লাহর কসম! আমার ভাইয়েরা তো আগে চলে গেছে। দুনিয়ায় তারা কিছুই ভোগ করতে পারেনি। আর আমরা তো তাদের রোপণ করা গাছের ফল পেড়ে খাচ্ছি। এই বিষয়টি আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে!"[৪]

৪ আল্লামা ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াঃ ৭/৫৫৪।

উম্মুল মুমিনিনদের সম্পদ এবং দানের পরিমাণ

"আধখানা খেজুর দান করে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করো।"

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণকে 'উম্মুল মুমিনিন' বা মুমিনদের মা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বেশিরভাগ স্ত্রীকে মোহরানা হিসেবে প্রায় ৪০০ দিরহাম প্রদান করেন। তবে, আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ে উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে মোহরানা হিসেবে ৪০০ দিনার দেওয়া হয়; যেই অর্থ আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশি রাহিমাহুল্লাহ রাসূলুল্লাহর পক্ষে প্রদান করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবদ্দশায় তাঁর স্ত্রীদেরকে হাতখরচ দিতেন।

খাইবার বিজয়ের পর প্রত্যেক স্ত্রীর নামে আলাদা করে বছরে ৮০ ওয়াসাক খেজুর এবং ২০ ওয়াসাক যব নির্ধারিত করেছিলেন। আরেক বর্ণনামতে ১০০ ওয়াসাক শুধু খেজুরই বরাদ্দ দিয়েছিলেন। আরও ২০ ওয়াসাক দিয়েছিলেন যব।[১]

এক ওয়াসাক = ৬০ সা'। আর এক সা' হচ্ছে ২.৪০ কেজি। এক ওয়াসাকের পরিমাণ হয় ১২২.৪ কেজি। তাহলে ১০০ ওয়াসাকে হয় বর্তমানের ৩০৬ মণ।

---

১ সহিহ বুখারি: ২৩২৮, সুনানে আবু দাউদ: ৩০০৮।

খেজুর ও যবের মণ গড়ে যদি ৫০০০ টাকা করে ধরা হয় তাহলে বর্তমানে সেই অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় দেড় লক্ষেরও বেশি। তার মানে বছরে নবিজি তাঁর স্ত্রীগণকে খরচ দিতেন মোটামুটি দেড় লক্ষ টাকা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহু পৈতৃক সূত্রে ব্যবসার উত্তরাধিকারী হন। তাঁর বাণিজ্য পণ্য সিরিয়ায় যেত এবং তাঁর একার পণ্য কুরাইশদের পণ্যের সমান হতো।[২]

এ থেকে বুঝা যায়, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন মক্কার সবচেয়ে সম্পদশালী নারী। তিনি মজুরি বা অংশীদারীর বিনিময়ে যোগ্য লোক নিয়োগ করে দেশ-বিদেশে পণ্য কেনা-বেচা করতেন।[৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিয়ের পর তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ স্বামীর হাতে তুলে দেন।[৪]

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে সবার জন্য ভাতা নির্ধারণ করা হয়। উমর ইবনুল খাত্তাব ভাতা বণ্টনের জন্য স্কেল তৈরি করেন। ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস, ফোর্থ ক্লাস স্কেল। উম্মুল মুমিনিনগণ ভাতা পেতেন ফার্স্ট ক্লাস স্কেলে। তাঁদের জন্য প্রথমে বার্ষিক ভাতা ধার্য করা হয় ১০,০০০ দিরহাম। পরবর্তীতে সেটা বাড়িয়ে ১২,০০০ দিরহাম করা হয়।[৫]

সেই যুগের বার্ষিক ভাতা ১২ হাজার দিরহাম বর্তমান সময়ের প্রায় ১ কোটি টাকা। উম্মুল মুমিনিনগণ তাঁদের প্রাপ্ত ভাতার বেশিরভাগ অংশ দান করতেন।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে একবার ৭০ হাজার দিরহাম জমা হয়। তিনি সবগুলো অর্থ আল্লাহর রাস্তায় দান করেন।[৬]

---

২ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৮/১০।

৩ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৮/১০।

৪ ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, আসহাবে রাসুলের জীবনকথা: ৫/৩৩।

৫ ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবি, উমর ইবনুল খাত্তাব: ২/৬৩-৬৪।

৬ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৮/৪৭।

তাঁর বোনপো আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে ১ লক্ষ দিরহাম উপহার দেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একদিনের মধ্যেই পুরো অর্থ দান করেন। ঐদিন তিনি রোজা ছিলেন। ইফতার কিনবেন সেজন্য কোনো অর্থ রাখেননি![৭]

আরেকবার মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে ১ লক্ষ দিরহাম উপহার দেন। সেদিনও তিনি রোজা ছিলেন। সন্ধ্যা হবার পূর্বেই তিনি সবগুলো অর্থ দান করে দেন, নিজের জন্য একটি দিরহামও রাখেননি।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বোনপো। তিনি তাঁর মা এবং খালা সম্পর্কে মন্তব্য করেন:

> *"আমি আয়িশা ও আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহুন্নার চেয়ে অধিক দানশীল কোনো নারীকে দেখিনি। তাদের দুজনের দানের বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্ন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একটু একটু করে সঞ্চয় করতেন। যখন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হতো, তখন দান করতেন। আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আগামী দিনের জন্য কিছুই তুলে রাখতেন না (যা পেতেন, সবই দান করতেন)।"*[৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেক স্ত্রী যাইনাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা এত দান করতেন যে, তাঁর ডাকনাম হয়ে গিয়েছিল 'উম্মুল মাসাকিন' বা গরিবদের মা। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে তিনি উম্মুল মুমিনিনদের জন্য প্রথম শ্রেণির ভাতা নির্ধারণ করেন। যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহার জন্য ভাতা নির্ধারণ করা হয় ১২,০০০ দিরহাম। প্রথমবার ভাতা দেখে তিনি দু'আ করেন, "হে আল্লাহ! ভবিষ্যতে এই সম্পদ যেন আমাকে আর না পায়। ধন-সম্পদ তো হলো ফিতনা।"

তিনি ভাতার অর্থগুলো আত্মীয়স্বজন এবং অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করেন।[৯]

---

৭ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৮/৪৭-৪৮।

৮ ইমাম বুখারি, আদাবুল মুফরাদ: ২৮০।

৯ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৮/৭৯।

খলিফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে সংবাদটি পৌঁছালে তিনি বলেন, "এই মহিয়সী নারীর মাধ্যমে কেবল কল্যাণই আশা করা যায়।"

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য আরও ১,০০০ দিরহাম পাঠালে সেগুলোও তিনি দান করে দেন।[১০]

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে বললেন,

> *"তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে লম্বা, সে সবার আগে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে।"*

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করলে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে কে সবার আগে ইন্তেকাল করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি তাঁর নাম না বলে একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বললেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল হাত মাপামাপি। কার হাত সবচেয়ে লম্বা?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর স্ত্রীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইন্তেকাল করলেন যাইনাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা। কিন্তু, তাঁর হাত তো অন্যদের তুলনায় ছোট ছিল। তাহলে?

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথার মর্ম বুঝতে পারেন। কারণ, তিনি 'লম্বা হাত' দ্বারা দানশীলতা ও হাতের দ্বারা কাজ বুঝিয়েছেন।[১১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন সবচেয়ে দানশীল। পাশাপাশি, তিনি ছিলেন হস্ত শিল্পে পারদর্শী। তিনি সুঁই দিয়ে বিভিন্ন জিনিস সেলাই করতেন।[১২]

---

১০ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৮/৭৯।

১১ সহিহ মুসলিম: ৬২১০, তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৮/৭৭।

১২ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৮/৭৭।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেকজন স্ত্রী ছিলেন 'যাইনাব' নামে। তাঁর পুরো নাম ছিল যাইনাব বিনতে খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তাঁকেও ডাকা হতো 'উম্মুল মাসাকিন' নামে। জাহেলি যুগ থেকেই তিনি 'গরিবদের মা' নামে পরিচিত ছিলেন।[১৩]

১৩ তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৮/৮২।

পরিশিষ্ট

হাতে দুনিয়া, হৃদয়ে আল্লাহ

মূল
শায়খ তাওফিক চৌধুরী

আপনি কি জানেন, অস্ট্রেলিয়ায় কতজন মুসলিম মিলিয়নিয়ার আছেন? আমি একটি রিপোর্টে দেখলাম, অস্ট্রেলিয়ায় ৫০০ জন মুসলিম মিলিয়নিয়ার আছেন। অস্ট্রেলিয়ায় মোট মুসলিমের মধ্য থেকে শতকরা মুসলিম মিলিয়নিয়ারের হার হলো .০০৩%। অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়ায় ইহুদি মিলিয়নিয়ারের শতকরা হার হলো ৩৭%। আমেরিকায় প্রায় ৪৫,০০০ মুসলিম মিলিয়নিয়ার, যুক্তরাজ্যে প্রায় ১০,০০০। সেই দুটো দেশে বসবাসরত মুসলিমদের মধ্যে মিলিয়নিয়ারের শতকরা হার হলো .০০৪৫%।

অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ ৫০০ ধনীর মধ্যে কতজন মুসলিম আছেন? কয়েক বছর আগের লিস্টে মাত্র একজন ছিলেন। তিনি হলেন ক্রেজি জন। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন, তিনি মুসলিমদের জন্য অনেক মসজিদ নির্মাণ করেন। কয়েক বছর পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার শীর্ষ ৫০০ ধনীর মধ্যে ১৫০ জনের অধিক হলো মুসলিম।

এই তথ্যগুলো আমি শুরুতেই কেন বললাম? একটি বিষয় বুঝানোর জন্য আমি তথ্যগুলোর উল্লেখ করলাম। সেটা হলো—আমরা সম্পদের দিক থেকে সম্পদশালী, কিন্তু আর্থিক দিক থেকে গরিব। এটার মানে কী? এটার মানে হলো—আমাদের অনেক জনসম্পদ আছে,

আমাদের অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, কিন্তু আমরা সেগুলো কাজে লাগাতে পারছি না।

আপনি ভাবতে পারেন, কেন আমি মিলিয়নিয়ারদের উদাহরণ এখানে টানলাম। আপনি ভাবতে পারেন, আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু খেজুর খেয়ে দিন কাটাতেন, তাঁর চুলোয় আগুন জ্বলত না দীর্ঘদিন, আর আমি মিলিয়নিয়ারের কথা বলছি! আপনার মতো আমারও একই প্রশ্ন ছিল।

আমি আমার শায়খ শানকিতী রাহিমাহুল্লাহকে এই প্রশ্নটি করি। আমি জিজ্ঞেস করি—"শায়খ, আমার মা-বাবা চান আমি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হই, অনেক টাকা উপার্জন করি। অন্যদিকে ইসলাম আমাকে দুনিয়া বিমুখতার কথা বলে। এই দুটো বিষয়কে কীভাবে মিলিয়ে চলব? আমাদের এই সময়ে আমি গরিব হব নাকি ধনী হব?"

তিনি আমাকে জবাব দেন,

> *"তাওফিক, শক্তিশালী মুসলিম হলো সে, যার হাতে থাকে দুনিয়া আর হৃদয়ে থাকেন আল্লাহ। আল্লাহ এমন মুসলিমকে ভালোবাসেন।"*

অর্থাৎ, তোমার হাতে টাকা থাকবে। সেই টাকা দিয়ে তুমি ইচ্ছেমতো দান-সাদকা করতে পারবে, কারো করুণার পাত্র হওয়া লাগবে না।

একজন ব্যক্তি ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি আমাদের জন্য যুহুদের (দুনিয়া বিমুখতা) একটি বই লিখেন না কেন?" তিনি জবাব দেন, "আমি তো ইতোমধ্যে খারাজের ওপর একটি বই লিখেছি।" অর্থাৎ, আপনার সম্পদ কীভাবে বণ্টন করবেন, ব্যয় করবেন এই নিয়ে ফিক্বহী আলোচনার বই তিনি লিখেছেন। এটাই যে মানতে পারবে, তার জন্য এটাই যুহুদ।

ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ কথার অর্থ হলো, দুনিয়া বিমুখতা মানে ফকির হয়ে যাওয়া না।

আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

> *"(দুনিয়া) বিমুখতা মানে তুমি কিছুর মালিক হবে না, তা নয়। বরং এর মানে হলো—কোনো কিছু যেন তোমার 'মনিব' না হয়।"*[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

> *"শক্তিধর ইমানদার দুর্বল ইমানদারের তুলনায় আল্লাহর নিকট উত্তম এবং পছন্দনীয়।"*[২]

ইমাম আন-নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আলেমগণের মধ্যে ইজমা হলো-ধনী ইমানদার ব্যক্তি আল্লাহর কাছে গরিব ইমানদারের চেয়েও উত্তম।" কারণ কী? কারণ, ধনী ইমানদার ব্যক্তিটি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে আরেকজনের উপকারে আসতে পারে, যেটা গরিব ইমানদারের পক্ষে সম্ভব না; তাকে তো আরেকজনের ওপর নির্ভর করতে হয়, হাত পাততে হয়।

ইসলামের প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যখন দানের প্রয়োজন হতো, তিনি তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতেন। তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতেন, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতেন।

একজন ধনী মুসলিম আরেকজনের উপকারে আসতে পারে; যদি তার ধন-সম্পদ হৃদয়ে না থেকে হাতে থাকে। একুশ শতকে গরিব থাকাটা আপনার জন্য মর্যাদার না। আপনাকে এটা মনে করার সুযোগ নেই যে, আমি ভালো মুসলিম এই কারণে যে, আমার সম্পদ কম। আমি চাই আপনি ধনী হোন; কিন্তু আপনার ধন-সম্পদ যেন আপনার হৃদয়ে স্থান করে না নেয়।

শত্রুরা যদি আমাদেরকে আক্রমণ করতে আসে, আমরা কি বসে থাকব? আল্লাহর নির্দেশ হলো, যারা আমাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করে,

---

১ মিযানুল হিকমাহ: ৪/২৯৯০।

২ সহিহ মুসলিম: ৬৬৬৭।

আমরা যেন তাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিই। নবি দাউদ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ লোহা থেকে কীভাবে বর্ম বানাতে হয় সেটা শেখান।[৩]

ইহুদিরা আজ পৃথিবীর পরাশক্তি হিসেবে আছে কেন? তাদের অর্থ আছে এজন্য। আপনি হয়তো মনে করছেন, ঘরে বসে থাকব, কোনোভাবে খেয়ে দিন কাটাব, তারপর কবরে যাব। না, আল্লাহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ভূমিকা রাখার জন্য। আপনি শুধুমাত্র নিজের বাঁচার জন্য আসেননি। আপনি আরেকজনের জন্যও চিন্তা করবেন। শুধু নিজে খেলেই হবে, আরেকজন খেতে পারছে কিনা এটাও আপনাকে দেখতে হবে।

আজ মুসলিমরা কেন সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও গরিব? আমি খুঁজে দেখে তিনটি কারণ বের করলাম। আমি জানি না আমার কারণগুলোর সাথে আপনি একমত হবেন কি না।

১. অক্ষমতা ও অলসতা

শুধুমাত্র বসে থাকা, কিছু না করে থাকাটা আমাদের স্বভাব হয়ে গেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলো থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে দু'আ করেন:

> *"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি অলসতা, অতিশয় বার্ধক্য, গুনাহ আর ঋণ থেকে। আর কবরের ফিতনা এবং কবরের শাস্তি থেকে।"*[৪]

এই উম্মাহ জেগে উঠতে পারবে না, যদি না এই উম্মাহ অলসতা পরিত্যাগ করে। এজন্য সন্তানদের দিকে খেয়াল রাখতে হবে, তারা যেন অলস না হয়। দেখা যায়, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে

---

৩ সূরা সাবা ৩৪:১০।

৪ সহিহ বুখারি: ৬৩৬৮।

আমাদের চেয়েও অলস বানিয়ে ফেলি। সকালে ডেকে ঘুম থেকে তুলি, চুল আঁচড়ে দিই, রাতে ঘুমানোর আগে বিছানা গুছিয়ে দিই ইত্যাদি। না, সন্তানকে সবসময় আদর করে অযোগ্য বানাবেন না। তাদেরকেও কাজ শেখান, নিজের কাজ নিজে শিখতে উদ্বুদ্ধ করুন।

উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আবু উবাইদার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কাছে একটা চিঠি লিখেন। ঐ চিঠিতে তিনি সন্তানদেরকে দুটো জিনিস শেখানোর নির্দেশ দেন।

- সাঁতার কাটা।
- তীর চালানো।[৫]

আরেকটি বর্ণনায় পাওয়া—ঘোড়া চালানোর কথা।

এগুলো করলে কী হবে?

সন্তান যদি তীর চালানো শিখে, তাহলে সে সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণের গুরুত্ব বুঝতে পারবে। সে যদি সাঁতার শিখে, তাহলে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কীভাবে জীবনযাপন করা যায় বুঝতে পারবে। সে যদি ঘোড়া চালানো শিখে, তাহলে কীভাবে তার চেয়ে বড় একটি প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এটা বুঝতে পারবে। এসবের মাধ্যমেই নেতৃত্ব তৈরি হয়।

আমি আমার ছেলে ইউসুফকে ৫ বছর বয়সে ঘোড়া চালানো শিখিয়েছি। ৬ বছর বয়সে সাঁতার কাঁটা শিখিয়েছি। যদিও তীর চালানো শেখানোর সুযোগ হয়নি।

ইসলামে অযোগ্যতা এবং অলসতার কোনো জায়গা নেই। এই দুটোকে আপনি প্রশ্রয় দিতে পারবেন না। এই দুটো থেকে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টার পর চেষ্টা করে যান।

২. আল-ওয়াহন: দুনিয়ার প্রতি মোহ ও মৃত্যুকে অপছন্দ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি হাদিসে মুসলিমদের কারণ বলতে গিয়ে 'আল-ওয়াহন'-এর কথা বলেন।

---

৫ মুসনাদে আহমাদ: ৩২৩।

সাহাবিরা জিজ্ঞেস করেন, "আল-ওয়াহন কী?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

> *"দুনিয়ার প্রতি মোহ ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা।"*[৬]

আমরা মৃত্যুকে এতটাই অপছন্দ করি যে, আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ করতে রাজি হই না! এর ফলে আমরা নতুন কোনো সুযোগ গ্রহণ করতে চাই না। আমরা কোথাও ঝুঁকি দেখলেই পালিয়ে বেড়াই। আমরা চাকরি করতে বেশি আগ্রহী, ব্যবসা করতে চাই না। কারণ কী? কারণ, আমরা ঝুঁকি নিতে চাই না।

৩. ভয়

মুসলিমদের ব্যর্থতার আরেকটি কারণ হলো—ভয়। আপনি যদি ভয় পান, আপনি ড্রাইভিং শিখতে পারবেন না। কিন্তু আপনি ভয়কে জয় করতে পারলে আকাশে উড়ে বেড়াতে পারবেন। আল্লাহ কুরআনে আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দেন, আমরা যেন তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ভয় না পাই।[৭]

ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু, সেই ভয় পাওয়াটাকে জয় করতে হবে। আপনি যদি কোনো উদ্যোগ নিতে চান, আপনি যদি দুনিয়া বদলে দিতে চান, আপনাকে ভয় পাওয়া চলবে না।

আমি যখন আমার জীবনের প্রথম লেকচার দিই, আমার হাত-পা তখন কাঁপছিল। অথচ এখন! আলহামদুলিল্লাহ, আমার প্রায় ২০০-এর মতো লেকচার আছে। পৃথিবীর নানান প্রান্তে আমি লেকচার দিয়েছি।

আপনাদেরকেও এমন ভয় পাওয়াটা কমাতে হবে। আপনি যা পারেন, সেটাতে মন দিন। কিন্তু, ভয় পাবেন না। রবার্ট কিয়োসাকি, যিনি *'Rich Dad, Poor Dad'* বইয়ের লেখক; তিনি তার বইয়ে লিখেন—"আপনি আপনার চাকরি ছাড়ার আগে এই বইটি পড়ুন।"

---

৬ সুনানে আবু দাউদ: ৪২৯৭।

৭ সূরা মায়িদাহ ৫:৪৪।

সেই বইয়ে তিনি লিখেন—"যে কারণে মানুষ সুবর্ণ সুযোগও নিতে চায় না, সেটা হলো ভয়।"

আপনি যদি পৃথিবীর যেকোনো সফল ব্যক্তির জীবনী পড়েন, তাহলে দেখতে পাবেন তাদের সবাই জীবনে ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তারা স্রোতের গতিতে পথ চলেননি, স্রোতের বিপরীতে চলে গতিপথ বদলে দিয়েছিলেন।

রিচার্ড ব্রানসন ছিলেন ইংরেজ বিজনেস ম্যাগনেট। তিনি তার কার বিক্রি করে ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। তার ব্যবসা ছিল ক্যাসেট রেকর্ড বিক্রি। আপনি যদি কোনো ত্যাগ স্বীকার না করেন, ঝুঁকি না নেন, তাহলে কীভাবে সফল হবেন?

যে তিনটি সমস্যার কথা বললাম, এগুলো জয় করতে পারলে আশা করা যায় মুসলিমরা তাদের হারানো মর্যাদা ফিরে পাবে। মুসলিম সমাজ থেকে দরিদ্রতা দূর হবে।

আল্লাহ চান, আমরা যেন নেতৃত্ব দিতে পারি। আরেকজনের অধীনে কাজ করব, বিষয়টি এমন না। কুরআনের একটি আয়াত থেকে তা স্পষ্ট বুঝা যায়। আল্লাহ বলেন:

> *"আর আল্লাহ কখনো মুমিনদের বিপক্ষে কাফিরদের জন্য পথ রাখবেন না।"*[৮]

আমি চাই, মুসলিমদের মধ্য থেকে উদ্যোক্তা বের হবে। তারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিবে।

---

৮ সূরা আন-নিসা ৪:১৪১।

ব্যবসাও একটি নেক আমল

মূল:
মুফতি তাকি উসমানি

অনুবাদ:
মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

সম্মানিত উপস্থিতি!

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

আমার জন্য এটি অত্যন্ত আনন্দের মুহূর্ত যে, আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করার সুযোগ পাচ্ছি। আমার এ আনন্দ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে যখন জেনেছি যে, এখানে যারা উপস্থিত আছেন তারা নিজেদের ব্যবসাকে শরিয়তের আদলে গড়ে তোলার চিন্তা ও সংকল্প নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

আজকাল সভা-সম্মেলন তো অনেক হয়। বক্তৃতা-বিবৃতিও হয় প্রচুর। কিন্তু সেই সভা, সম্মেলন, বক্তৃতা ও বয়ান আমাদের বাস্তব জীবনে কোনো বড় পরিবর্তন সাধন করে না। এর এক কারণ, সেগুলো 'বসলাম, বললাম এবং চলে গেলাম' এই গতানুগতিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

কিন্তু শ্রদ্ধেয় জনাব রফিক আহমদ সাহেব এইমাত্র যে কথাটি বললেন তাতে আমি অনুপ্রাণিত বোধ করছি। তিনি বলেছেন, 'আজ আমরা এ সংকল্প নিয়ে এই মাহফিলে সমবেত হয়েছি যে, আমরা আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আমাদের জীবনযাত্রাকে শরিয়তের

আদলে ঢেলে সাজানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করব। যেসব নির্দেশনা এখানে আমরা লাভ করব তা শোনার পর এখান থেকে আমরা এ অঙ্গীকার নিয়ে উঠব যে, এখন থেকে আমরা সম্পূর্ণ নতুন মানুষ।'

কত বড় কথাই না তিনি বললেন! আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এর ওপর আমল করার তাওফিক দান করুন!

মুসলমানের গোটা জীবনই হতে পারে পুণ্যময়

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর ফজল ও করমে আমাদেরকে এমন দ্বীন দান করেছেন, যার মধ্যে মানবীয় প্রয়োজনের কোনো দিককেই অবহেলা বা উপেক্ষা করা হয়নি। আপনারা জেনে থাকবেন, কুরআনে কারিম পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে তা হলো—

আল্লাহ তায়ালা বলছেন, আমি মানুষ এবং জিনকে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। তারা আমার ইবাদত করবে— কেবল এ উদ্দেশ্যেই তাদের সৃষ্টি করেছি। [সূরা যারিয়াত ৫১: ৫৬]

তো মানুষকে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্যই যখন এই, তখন কর্তব্য ছিল, সকাল-সন্ধ্যা, দিবারাত্রি মানুষের আর কোনো কাজ থাকবে না; শুধু আল্লাহর ইবাদত করবে।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর অসীম অনুগ্রহে মানুষ সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও তাকে তার মানবীয় প্রয়োজন পূরণ করারও অনুমতি দিয়েছেন। অর্থাৎ সে নিজের ও পরিবার-পরিজনের জীবনোপকরণ এবং বসবাসের চাহিদা পূরণ করতে পারবে।

এ কারণে আল্লাহ তায়ালা এমন এক দ্বীন আমাদেরকে দান করেছেন, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনের সকল চাহিদা পূরণ করতে পারি। শুধু প্রয়োজন পূরণ পর্যন্তই শেষ নয়, বরং এগুলোকে নেক আমলেও পরিণত করতে পারি।

আল্লাহর নৈকট্য

পৃথিবীতে এমন অনেক ধর্ম আছে, যার দৃষ্টিভঙ্গি হলো, আল্লাহ তায়ালাকে ততক্ষণ পর্যন্ত পাবেন না অর্থাৎ তাঁর নৈকট্য-সন্তুষ্টি লাভ করবেন না, যতক্ষণ না আপনি দুনিয়ার সকল কর্মব্যস্ততা ত্যাগ করে আশ্রম-উপাসনালয়ে গিয়ে ঠাঁই নিবেন এবং নির্জন সাধনার জীবন গ্রহণ করবেন। বহু ধর্ম এমন আছে, যার বক্তব্য হলো— দ্বীন এবং দুনিয়া একসঙ্গে চলতে পারে না।

আপনারা তো এমন এক দেশে (ভারতে) বসবাস করেন যেখানে অবশ্যই আপনারা দেখেছেন অথবা শুনেছেন যে, অনেক মানুষ আত্মসংযম ও আত্মপীড়নের নানাবিধ আচার-সংস্কার পালন করে এ ধারণা করছে যে, আমরা খোদার প্রিয়ভাজন হয়ে গেছি। তারা কেমন সব কষ্ট-সাধনা করে। উপবাস থেকে দিন কাটায়। উদোম-উলঙ্গ হয়ে সময় যাপন করে। নিশ্বাস অবরুদ্ধ করে করে আত্মদমনের তপস্যা করে।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এমন এক দ্বীন দান করেছেন, যার মধ্যে যদিও জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইবাদত বলা হয়েছে; কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সব কায়-কারবার ছেড়ে দিয়ে বসে যাও। বরং এমন এক আদর্শ আমাদেরকে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে জীবনের নানাবিধ প্রয়োজন পূরণে বাধা থাকে না, আয়-উপার্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই গতিশীল থাকে। শুধু যে গতিশীল থাকে এমন নয়; বরং ব্যবসা একটি নেক আমলের রূপ লাভ করে।

সৎ ব্যবসায়ীদের হাশর হবে নবিগণ ও সিদ্দিকিনের সাথে

ছোট্ট একটি বিষয়, যার প্রতি যত্নবান হলে সকল কারবার নেক আমলে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সেটা হলো, আল্লাহ তায়ালা কিছু বিষয় হালাল করেছেন আর কিছুকে হারাম। তন্মধ্যে হারামকে ছেড়ে হালালকে গ্রহণ করা। পাশাপাশি একথাও বলে দিয়েছেন—

তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়। [সূরা মুনাফিকুন ৬৩ : ৯]

এটা হতে পারবে না যে, ব্যবসায় মত্ত হয়ে আপন দ্বীনি কর্তব্য ভুলে যাবে। আল্লাহ তায়ালাকে মনে রাখবে না। বরং তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহকে স্মরণ রাখা এবং হালাল পদ্ধতিতে আয় উপার্জনের চেষ্টা করা। হাদিস শরিফে এসেছে—

> *সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবিগণ, সিদ্দিকিন এবং শহিদগণের সঙ্গে থাকবে। [জামে তিরমিযী হাদিস ১২০৯]*

ইমাম বুখারি (রহ).-এর ব্যবসা

ইমাম বুখারি (রহ.), যার কিতাব বুখারি শরীফ অত্যন্ত বিখ্যাত। তিনিও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ব্যবসার অঙ্গনে— 'সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী'-এর এক আদর্শ নমুনা বানিয়েছিলেন।

ইতিহাসে তাঁর সম্পর্কে আছে যে, একবার কিছু লোক তাঁর কাছে এসে কোনো একটি পণ্যের সওদা করে চলে যায়। হযরত ইমাম বুখারি (রহ.) মনে মনে ঠিক করলেন, এ পণ্যটির বিক্রয়মূল্য পাঁচ হাজার দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) ধার্য করব। তিনি এখনো এ বিষয়ে কোনো চুক্তি বা লেনদেন করেননি। শুধুই অন্তরে নিয়ত করেছিলেন। কিন্তু ঐ লোকদের আসতে দেরি হচ্ছিল। সম্ভবত দুয়েকদিন পেরিয়ে গেলেও তারা আসল না। ইতিমধ্যে নতুন একদল এসে সেই পণ্যটিই দশ হাজার দিরহাম মূল্যে কিনতে চাইল। ইমাম বুখারি (রহ.) বললেন, আমার কাছে আগে একদল গ্রাহক এসেছিলেন। আমি তাদেরকে এটি পাঁচ হাজার দিরহামে দিব বলে নিয়ত করেছিলাম। তাই এখন এটা আপনাকে বিক্রি করতে পারব না। তারা বলল, এখনো তো আপনার লেনদেন পূর্ণ হয়নি!

তখন ইমাম বুখারি (রহ.) উত্তর দিলেন, লেনদেন বা চুক্তি হয়নি সত্য, কিন্তু আমি মনে মনে স্থির করে নিয়েছিলাম যে, পাঁচ হাজার দিরহামে তাকে এটি দিয়ে দিব। তাই দশ হাজার দিরহামে এটি

তোমাকে দিতে আমার মন আগাচ্ছে না। এভাবে তিনি দশ হাজার দিরহামের প্রস্তাবটি বাতিল করে দিলেন। তারপর যখন সেই প্রথম দল আসল, তখন তাদের কাছে পাঁচ হাজার দিরহামেই জিনিসটি বিক্রি করলেন। [ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ১/৪৮০]

সহিহ বুখারির আরও একটি ঘটনা

এ ইমাম বুখারি (রহ.)-ই তাঁর কিতাব বুখারি শরীফে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক ব্যক্তি একজন লোকের কাছে জমি বিক্রি করল। জমিটির খরিদ্দার যখন তাতে খোঁড়াখুঁড়ি করছিল তখন ঘটনাক্রমে সেখানে স্বর্ণমুদ্রায় ভর্তি একটি কলস বেরিয়ে আসল।

কলসটি নিয়ে লোকটি জমি বিক্রেতার কাছে এসে বলল, ভাই, তোমার জমিতে এ স্বর্ণমুদ্রাগুলো পেলাম। তাই এগুলো তোমার। কারণ, আমি তো তোমার কাছ থেকে শুধু জমি কিনেছি, স্বর্ণ কিনিনি। উত্তরে জমি বিক্রেতা বলল, এটা আমি নেব না। কেননা, আমি যখন জমি বিক্রি করেছি, তখন তার মধ্যে যা ছিল সেটাও তোমাকে বিক্রি করে দিয়েছি। এবার দু'জনের মাঝে উল্টো ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। একজন বলে, নাও। অন্যজন বলে, নেব না।

এমনকি বিষয়টি একপর্যায়ে কাজির দরবার পর্যন্ত চলে গেল এবং পুরো ঘটনা তাকে জানানো হলো। সবকিছু শুনে কাজি সাহেব ফয়সালা করলেন যে, তোমাদের দু'জনের কোনো ছেলে-মেয়ে আছে? সৌভাগ্যক্রমে দেখা গেল, একজনের একটি ছেলে আছে। আর অন্যজনের একটি মেয়ে আছে। কাজি সাহেব তখন বললেন, তোমার ছেলের কাছে তোমার মেয়েকে বিয়ে দাও। আর এ স্বর্ণগুলো তাদের মাঝে বণ্টন করো। এভাবেই এ ঝগড়ার অবসান হয়। [সহিহ বুখারি, হাদিস ৩৪৭২]

ব্যবসা একটি নেক আমল

মোটকথা ব্যবসা যখন আমানতদারি, বিশ্বস্ততা এবং সততার সঙ্গে করা হবে তখন এটি নেক আমলে পরিণত হবে। দোজাহানের সর্দার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ব্যবসা করেছেন এবং ব্যাপক পরিসরে করেছেন। যাকে আজকাল ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড বলা হয়। এ অঙ্গনে তিনি আমাদের জন্য অনেক আদর্শ রেখে গেছেন। যদি ঈমানদারি, আমানত ও সততা আমাদের মাঝে এসে যায় তবে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডগুলো নেক আমলে পরিণত হবে।

ভারতবর্ষে ইসলাম

আপনারা জানেন, ভারতবর্ষের মাটিতে যেখানে আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা এত বিপুল সংখ্যক মুসলমান। এ ভূখণ্ডে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচারকারীগণ মুজাহিদ ছিলেন না যে, জিহাদের মাধ্যমে তাঁরা এখানে ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছেন। কোনো তাবলিগী জামায়াতও এখানে আসেনি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে। এ অঞ্চলে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচারকারী ছিলেন কিছুসংখ্যক সাহাবি ও তাবেঈ। যারা ব্যবসায়ী বেশে মালাবার অঞ্চলে এসেছিলেন। তারা নিজেদের ব্যবসার মাধ্যমে এমন সুমহান আদর্শ স্থাপন করেছিলেন যে, এ অঞ্চলের মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি সীমাহীন অনুরাগ জন্ম নেয়। ফলে ইসলামের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে এবং ইসলামকে তারা একটি শ্রেষ্ঠ দ্বীনরূপে গ্রহণ করে নেয়। হযরত সাহাবা-তাবেঈন (রা.)-এর কর্ম ও আচরণের গুণে, তাদের সততা-বিশ্বস্ততা এবং ঈমানদারির বদৌলতে ইসলাম প্রসারিত হয়েছিল।

আমাদের জন্য একটি সুযোগ

আজ আল্লাহ তায়ালা তাঁর ফজল ও করমে আপনাদেরকে এ সুযোগটি দান করেছেন। কারণ, আপনারা এমন এক সমাজে ব্যবসা করেন, যেখানে প্রতিনিয়ত অমুসলিমদের সঙ্গে আপনাদের উঠাবসা-লেনদেন

হয়। তারা আপনাদের ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। আপনাদের দোকানে চাকরি করে।

আপনারা যদি তাদের সামনে নিজেদের আমলের সর্বোত্তম নমুনা পেশ করেন অর্থাৎ তাদের প্রতি আন্তরিক ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করেন, তাদের সাথে সৎ ও ন্যায়সঙ্গত মোআমালা করেন এবং তাদেরকে সত্য দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দেন, তাহলে আপনার ব্যবসা কেবল ব্যবসাই থাকবে না; বরং একটি দাওয়াতে পরিণত হবে এবং এর একেকটি মুহূর্ত আল্লাহ তায়ালার দরবারে সওয়াব ও প্রতিদান লাভের কারণ হবে। প্রতিনিয়ত অমুসলিমদের সঙ্গে আমাদের উঠাবসা হয়। কিন্তু আমাদের এ বিষয়টি মনে থাকে না যে, আল্লাহ তায়ালা একজন মুসলমান হিসেবে আমাকে দ্বীনের একজন দাঈও বানিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন—

> *(মুসলমানেরা!) তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। সমগ্র মানবতার কল্যাণের জন্য যাদের আবির্ভাব। [সূরা আলে ইমরান ৩ : ১১০]*

সমগ্র মানবতাকে কল্যাণ ও সাফল্য এবং সঠিক পথে আনার মেহনত আমাদের দ্বীনি কর্তব্যের অংশ।

যারা অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতের মেহনত করেন, তারা নিজেদের কর্ম ও আচরণের মাধ্যমে অমুসলিমদেরকে কাছে টানুন। তাদের সহমর্মী হোন। তাদের দুঃখ-দুর্দশায় শরিক হোন। এভাবে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিন। এ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করলে আপনারা দেখবেন, সেই পরিবেশ, যা মালাবারে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সৃষ্টি করেছিলেন। ইনশাআল্লাহ সেটা আজও সৃষ্টি হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা তাওফিক দান করুন।

হালাল উপার্জনে বরকত

আসল বিষয় দুটি। এক. ব্যবসা সম্পর্কিত যে কাজই করা হোক তা যেন শরিয়তের গণ্ডির মধ্যে হয়। কোনো কোনো সময় মানুষ মনে করে,

যদি আমি এ লেনদেনে শরিয়তের হুকুম অনুযায়ী আমল করতে যাই, তাহলে আমার টাকা কমে যাবে অথবা মুনাফায় ঘাটতি দেখা দিবে। কিন্তু এটা অনেক বড় ধোঁকা।

মনে রাখবেন, আসল জিনিস টাকার পরিমাণ বা কোয়ান্টিটি নয়; আসল হচ্ছে তার মান ও কোয়ালিটি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা এরই মধ্যে বরকত দান করে থাকেন। আপনারা দেখে থাকবেন, কখনো কখনো সামান্য টাকার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা এত বরকত দান করেন যে, এর দ্বারা অগণিত কাজ সম্পাদিত হয়ে যায়। আর কোনো সময় অঢেল টাকার স্তূপ থাকে; কিন্তু তার সবটাই রোগ-শোক, হাসপাতাল আর আইন-আদালতের পিছে ব্যয় হয়ে যায়।

তাহলে বলুন, যেই বিপুল পরিমাণ সম্পদ হাসপাতালে ডাক্তারের কাছে খরচ হলো এবং উকিলদের চেম্বারে আইন-আদালত করতে গিয়ে ব্যয় হয়ে গেল, সেটা উত্তম, না সেই অল্প সম্পদ, যা দ্বারা আপনি ভরপুর লাভবান হলেন? আল্লাহ তায়ালা সর্বদা বরকত রেখেছেন হালাল উপার্জনে।

হারামের মধ্যে বে-বরকতি

হারাম সম্পদে বরকত হয় না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

> *আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন আর সদকাকে বাড়িয়ে দেন।*
> *[সূরা বাকারা ২ : ২৭৬]*

মানুষ বলে, সুদে তো সম্পদ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কুরআন বলছে, বৃদ্ধি পায় না; বরং তার বরকত খতম হয়ে যায় এবং তার শান্তিও শেষ হয়ে যায়।

গণনার পৃথিবী

আজকের পৃথিবী নিছক গণনার পৃথিবী হতে চলেছে। গণনার কারণে মানুষ ভাবছে, আমাদের অর্থের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আমরা লাভবান হয়ে

যাব। প্রকৃতপক্ষে গণনার প্রবৃত্তি লাভের পরিবর্তে লোকসানই ডেকে আনছে।

তাই আমরা পূর্ণ প্রতিজ্ঞা করে নেই, যেটুকু অর্থ আসবে তা যেন হালালভাবে আসে; যেভাবে শরিয়ত হালাল করেছে। তা পরিমাণে কম হলেও ইনশাআল্লাহ তার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা এমন বরকত দান করবেন, যা অঢেল সম্পদের মধ্যেও হয় না। ব্যস, আমরা এ সংকল্প করে ব্যবসায় নেমে পড়ি। আল্লাহর রহমতে আশা করা যায়, এ ব্যবসা নেক আমলে পরিণত হবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তার ফায়দা অনুভব করা যাবে।

ব্যবসা তরবিয়তের ওসিলা

আল্লাহ তায়ালা ব্যবসাকে এমন এক মাধ্যম বানিয়েছেন যে, এটা মানুষের তরবিয়ত করে। এমনি তো পৃথিবীতে পেশার সংখ্যা অনেক। কিন্তু ব্যবসার মধ্যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের প্রশিক্ষণ হয়। যে লোক কোথাও কোনো চাকরি করছে, তার তো জানা আছে যে, মাস শেষে আমি এ পরিমাণ বেতন পাব।

কিন্তু ব্যবসায়ী যখন ব্যবসা করে তখন সে নিশ্চিতরূপে কিছুই জানে না যে, কী অর্জন হবে! এজন্য তার পুরো ব্যবসা এবং সকল কাজ আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। আর এ তাওয়াক্কুলই এমন মহৎ গুণ, যা মানুষের অন্তর্জগৎকে অসাধারণ তরবিয়ত করে।

আমার বড় ভাইয়ের ঘটনা

আমার সর্বজ্যেষ্ঠ ভাই মাওলানা যাকী কায়ফী ছাহেব, যিনি একজন স্বনামধন্য কবিও ছিলেন। 'কায়ফিয়্যাত' নামে তাঁর কাব্য সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। যদিও তিনি দরসে নেযামীর পাঠ পূর্ণ করেননি, কিন্তু উলামায়ে কেরাম এবং বুজুর্গদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তিনি কিতাবাদির ব্যবসা করতেন।

তিনি একবার তার নিজের ঘটনা শুনাচ্ছিলেন যে, একদিন সকালে আমি উঠে দেখি বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তাঘাটে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় হাঁটু সমান পানি ছিল। আমার অন্তরে খেয়াল এলো, আজ এই বৃষ্টির মধ্যে কে আমার কাছে কিতাব নিতে আসবে। সাধারণত এরূপ সময়ে লোকজন সর্বোচ্চ তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে বের হয়। কিতাব কেনার জন্য কে আসবে; তাও আবার দ্বীনি কিতাব! তাই আজকে আমি দোকান খুলব না।

এ ভাবনা আমার অন্তরে আনাগোনা করছিল। কিন্তু যেহেতু (ভাইজান) বুজুর্গদের সোহবতপ্রাপ্ত ছিলেন, তাই তৎক্ষণাৎ মন থেকেই উত্তর এসে গেল যে, গ্রাহক আসুক বা না আসুক। সেটা তোমার কাজ নয়। ব্যস, দোকান খুলে বসে যাও। গ্রাহক পাঠাবেন তো 'আরেকজন'। তিনি যদি চান তাহলে এ বৃষ্টির মধ্যেও গ্রাহক পাঠিয়ে দিবেন। অতএব, তুমি তোমার কাজ কর। আল্লাহ তাঁর কাজ করবেন।

ভাইজান বলেন, আমি ছাতা নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে বের হলাম। এরপর দোকান খুলে বসে তিলাওয়াত আরম্ভ করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে লক্ষ করলাম, লোকজন ছাতা মাথায় কিতাব কেনার জন্য দোকানে আসতে শুরু করেছে।

ব্যবসা অন্যান্য পেশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

তো আমি আরজ করছিলাম যে, গ্রাহক পাঠানো মূলত আল্লাহ তায়ালার কাজ। আমরা ব্যবসার মাঝে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের একটি শিক্ষা খুঁজে পাই। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা ব্যবসাকে অন্যান্য পেশার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। শুধু শর্ত একটি— শরিয়ত এবং সুন্নত মোতাবেক হতে হবে এবং তাতে মগ্ন হয়ে আল্লাহ থেকে গাফেল হওয়া যাবে না।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দান করুন—আমীন।

ইলহাম প্রকাশিত
বইয়ের তালিকা

	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
১.	নারী সুফিদের জীবনকথা	শায়খ আবু আব্দুর রহমান সুলামি
২.	মুজাদ্দেদে যামান আবূ বকর সিদ্দিকী (র.): জীবন ও তাসাউফচর্চা	অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
৩.	Journey Unknown (A Guide Book On Spiritual Learning)	Muhammad Nurul Islam Khan
৪.	হিফ্‌জ-যাত্রা	কারি মুবাশ্‌শির আনওয়ার
৫.	আরবি ভাষা অভিযান	মাসুদ শরীফ সম্পাদনা
৬.	মোহভঙ্গ	ইবনু কুদামা মাকদিসি
৭.	আশরাফি বয়ান সমগ্র প্রথম খণ্ড	মাওলানা আশরাফ আলি থানভি
৮.	গোলমেলে তাকদির	ড. উমার সুলাইমান আশকার
৯.	দুশ্চিন্তাকে দিই ছুট্টি	মুহাম্মাদ ইফাত মান্নান
১০.	স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের বিধি	মুহাম্মদ ইবনু আদাম কাওসারি
১১.	মহামারি মোকাবিলায় মুসলিম	মাসুদ শরীফ
১২.	ইমাম নববির ৪০ হাদিসের ব্যাখ্যা	উম্মু মুহাম্মাদ
১৩.	একমলাট সাহিত্যপাঠ	মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ
১৪.	আল-ইনসাফ ফি বায়ানি আসবাবিল-ইখতিলাফ	শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবি
১৫.	সহজ ভাষায় উসুলুল-ফিক্‌হ	উস্তাজ ফারহান জুবায়রি
১৬.	ইসলাম ১০১: ইসলামের প্রাথমিক বিধিবিধান	উস্তাজ মো. শাহ্‌দাৎ হোসেন
১৭.	নীড়	ইয়ামিন সিদ্দিক নিলয়
১৮.	শাশুড়ি-বউমার মেলবন্ধন	মুমতাজ রাফি
১৯.	আহলে বাইত (নবিপরিবার নিয়ে নবিজির কথা)	শাইখ আবদুল্লাহ বিন সালিহ বিন মুহাম্মাদ উবাইদ
২০.	কুরআনের গল্প	আরিফুল ইসলাম
২১.	অনলাইনের আদবকেতা	ওমর উসমান
২২.	মুশকিল আসান (দুআ ইউনুস রহস্য)	ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা
২৩.	মন্দ স্বভাব ভালো স্বভাব	ড. মুহাম্মাদ মানসুর
২৪.	মৃত্যু	মাওলানা মো. আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
২৫.	মুগ্ধতায় ইমাম গাজ্জালি	শাইখ মুস্তাফা আবু সাওয়ি

	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
২৬.	নবিজীবনের স্কেচ	শাইখ মুসা বিন রাশিদ আজিমি
২৭.	বাংলা সাহিত্যে মুসলমান	আবদুল মান্নান সৈয়দ
২৮.	হেলদি মুসলিম	কেইট হেপবার্ন
২৯.	চোরাবালি সমাজে প্রচলিত শির্ক বিদআত কুসংস্কার	মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী
৩০.	নবিজির (স.) যুগে নারী	আরিফুল ইসলাম
৩১.	রোজা-রমজানের মাসায়েল	শাইখ আহমদ মুসা জিবরিল
৩২.	প্রোডাক্টিভ হজ-উমরা	ইউসুফ বাদাত
৩৩.	মাই কনফেশন মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদির নাস্তিক থেকে আস্তিক হবার কাহিনি	সাজ্জাদ ইউনুস
৩৪.	আজ জুমাবার জুমার নামাজের বিধি-বিধান, জুমার দিনের ফজিলত	এস. এম. হারুন-উর-রশীদ
৩৫.	জ্ঞানের পথে চলার বাঁকে	শাইখ বাক্‌র আবু জাইদ শাইখ সালমান আওদা ইমাম ইবনু রাজার হানবালি
৩৬.	শানে সাহাবায় চল্লিশ হাদিস	আহমাদ আলী আবদুত তাওয়াব
৩৭.	সারি সারি সেতারা	মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
৩৮.	মাদরাসাজীবন	আহমাদ সাব্বির
৩৯.	মুসলিম ইতিহাসে উত্থান-পতন	ড. ইয়াসির ক্বাদি
৪০.	নবিজির সুন্নত : জীবন পথের পাথেয়	মুহাম্মাদ আলী জাওহার
৪১.	গাইডেন্স ফর মুসলিম উইমেন	বদিউজ্জামান সাইদ নুরসি
৪২.	অপার্থিব কুরআন কুরআনের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গির মুজিজা	শাইখ ড. মিতওয়াল্লি শারাওয়ি
৪৩.	কিয়াম নিয়ে যত কথা (কিয়ামের আদ্যোপান্ত নিয়ে লিখিত দলিলভিত্তিক সংকলন)	মুফতি খালিদ সাইফুল্লাহ
৪৪.	আমার জীবনের গল্প	ডাক্তার জাকির নায়েক
৪৫.	ফিকহে হানাফি ও হাদিস	আল্লামা যাহিদ কাউসারি
৪৬.	মুসলিম সভ্যতার ওপর কলোনিয়াল শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব	সাবিহা সাবা
৪৭.	কিয়াম নিয়ে যত কথা	ফখরুল ইসলাম

	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
৪৮.	মাওলানা তারিক জামিল বয়ান সমগ্র (২ খণ্ডে)	মুফতি শরিফুল ইসলাম নাঈম
৪৯.	দাম্পত্য রসায়ন	ড. ইয়াসির ক্বাদি
৫০.	ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহু জীবন ও সময়কাল	শাইখ মুহাম্মাদ আবু জাহরা রাহিমাহুল্লাহু
৫১.	দরুদ শরিফ	মাওলানা তৈয়ব তাহের
৫২.	প্রিয় নবির ﷺ রমজানের আমল	যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি দা. বা.
৫৩.	রিথিঙ্কিং ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি	মার্শাল জি এস হডসন
৫৪.	কোটিপতি সাহাবি	আরিফুল ইসলাম

ইলহাম প্রকাশিতব্য বইয়ের তালিকা

	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
১.	ইসলামি আইন ও পুরুষতান্ত্রিকতা	ড. মুহাম্মদ আত-তাওয়ীল
২.	বরকত লাভের উপায়	ইসমাইল কামদার
৩.	নিশিভোরে	খুররাম মুরাদ
৪.	রাসুলের ﷺ সংসার জীবন	মুফতি শরিফুল ইসলাম নাঈম
৫.	১০০ আলেমের জীবনী	মুফতি শরিফুল ইসলাম নাঈম

আরিফুল ইসলাম

পড়ালেখা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগে। জীবনী সাহিত্য নিয়ে তার আগ্রহ। রাসূলের জীবনী, সাহাবিদের জীবনী ইমামগণের জীবনী, নারী আলেমাদের জীবনী নিয়ে তার লেখা বই প্রকাশিত হয়েছে। 'কোটিপতি সাহাবি' বইটি লেখকের প্রকাশিত পঞ্চদশ বই।

কোটিপতি সাহাবি

ব্যবসায়ী সাহাবিদের জীবনী

আরিফুল ইসলাম

